সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক
শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়

মূল্য—বাঁধাই ৫০ আনা, সাধারণ ।।০ আনা

খাদি প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা
১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে
শ্রীহেমপ্রভা দাসগুপ্তা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯, বৈশাখ—২,০০০

প্রিণ্টার—
শ্রীচারুভূষণ চৌধুরী
খাদি-প্রতিষ্ঠান প্রেস
সোদপুর, ২৪ পরগণা

নিবেদন

প্রজনন এ যুগে সমাজের একটি বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিরোধের অনেকগুলি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। পন্থাগুলি ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রবল ভাবে অনুসৃত হইতেছে এবং ভারতেও যে হইতেছে না তাহা নহে। গান্ধীজী এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত 'Self-Restraint Versus Self-Indulgence' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

নর-নারায়ণের সেবা যাঁহার জীবনের ব্রত, মানবের এত বড় একটা কল্যাণের সম্পর্কে তাঁহার মত কি তাহা জানা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী পাঠকদিগকে তাঁহার এই মতবাদের সহিত পরিচিত করিবার জন্যই এই অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

১লা বৈশাখ,
১৩৩৯

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়

সূচীপত্র

সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার

সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার

১

সদাশয় বন্ধুরা ভারতীয় সংবাদ-পত্রের সেই সব প্রবন্ধ আমাকে কাটিয়া পাঠাইয়া দিতে সুরু করিয়াছেন, যে-সব প্রবন্ধে গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপাদন বন্ধ করার অনুমোদন করা হইতেছে। যুবকদের সহিত তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কেও পত্রাদির সংখ্যা আমার বাড়িয়া উঠিতেছে। আমার পত্র-লেখকেরা এমন অসংখ্য রকমের প্রশ্ন তুলিতেছেন, এখানে অতি সামান্য ভাবেই যাহার আলোচনা হইতে পারে। তাহা ছাড়া আমার আমেরিকাবাসী বন্ধুরাও এই বিষয়ে আমার কাছে নানা রকমের সাহিত্য প্রেরণ করিতেছেন। গর্ভ-নিরোধের কৃত্রিম পদ্ধতিগুলি অবলম্বনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ আমার উপর ক্রুদ্ধও হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অনেক বিষয়ে আমি আধুনিক-সংস্কারকদের অগ্রণী, সুতরাং জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধে মধ্য যুগে পড়িয়া থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন। এতদ্ব্যতীত ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ-নিরোধের পক্ষে সমস্ত দেশেই এমন সব নর-নারীও আছেন যাঁহারা অত্যন্ত চিন্তাশীল ও সংযত-বুদ্ধি।

এই সব দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম যে, যে-সব পদ্ধতির নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহার পক্ষে হয়তো জোরালো যুক্তি আছে। আর সেই

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হইয়াছিল যে, এ-সম্বন্ধে যতটুকু আমি বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু বলা দরকার। এই ভাবে সমস্যাটি সম্বন্ধে যখন আমি চিন্তা করিতেছিলাম এবং এ সম্পর্কে গ্রন্থাদি পড়ার কথা ভাবিতেছিলাম, তখনই আমার হাতে "Towards Moral Bankruptcy" নামক পুস্তকখানা আসিয়া পড়ে। বইখানি একেবারে ঠিক এই বিষয় লইয়াই লেখা এবং আমার মনে হয় লেখক সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবেই ইহার আলোচনা করিয়াছেন। এম-পল-বুরো ফরাসী ভাষায় মূল গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। গ্রন্থের ফরাসী নাম D' Indiscipline des moeurs—কথায় কথায় তর্জ্জমা করিলে মানে হয় 'নৈতিক চরিত্রে অসংযম।' এই অনুবাদ কনষ্ট্বল এণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত করিয়াছেন এবং ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন ডাঃ মেরি স্কারলিব্ সি-বি-ই, এম-ডি, এম-এস্ (লণ্ডন)। বইখানিতে ১৫ টি অধ্যায় আছে এবং ইহা ৫৩৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

গ্রন্থখানি পড়িয়া মনে হইল যে, গ্রন্থকারের মতের চুম্বক দেওয়ার আগে ন্যায়ের খাতিরে আমার মোটামুটি ভাবে সেই সব গ্রন্থও পড়া আবশ্যক, যাহাতে গর্ভ-নিরোধের পদ্ধতিগুলি সমর্থিত হইয়াছে। 'সারভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র কাছে এ সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক ছিল পড়ার জন্য আনাইয়া লইলাম। কাকা কালেলকারও এ সম্বন্ধে পড়া-শুনা করিতে-ছিলেন। হ্যাভেলক এলিসের যে খণ্ডগুলিতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে, তিনি আমাকে সেই খণ্ডগুলি পাঠাইয়া দিলেন। একজন বন্ধু 'প্র্যাক্টিশনারের' একখানা বিশেষ সংখ্যাও পাঠাইলেন। এই সংখ্যায় বিখ্যাত ডাক্তারদের কতকগুলি মূল্যবান অভিমত এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এম্-বুরো যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাঁহার যুক্তিগুলির সত্যতা একজন সাধারণ লোকের পক্ষে যতটা সম্ভব যাচাই করিয়া দেখিবার জন্যই আমি এই সাহিত্যগুলি সংগ্রহ করিতেছিলাম। বৈজ্ঞানিকও যখন কোন সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে থাকেন, তখন দেখা যায় তাহার দুইটি দিক থাকে, এবং উভয় দিকেই অনেক কিছু বলিবার থাকে। সেই জন্যই এম্-বুরোর বইখানি পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে, যাঁহারা নিরোধ-প্রথাকে সমর্থন করেন তাঁহাদের যুক্তিগুলিও যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। সমস্ত পড়িয়া শুনিয়া আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে, ভারতবর্ষের পক্ষে অন্ততঃ কৃত্রিম গর্ভ-নিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থাতেও উহাদের প্রয়োগ সমর্থন করেন, তাঁহারা হয় ত পদ্ধতিগুলিকেই জানেন না, অথবা জানিয়াও তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করাই পছন্দ করেন। কিন্তু যদি প্রমাণ করা যায় যে, পশ্চিমের পক্ষেও এই সব পন্থা হানিকর, তবে বিশেষ-ভাবে ভারতের অবস্থায় উহা পরীক্ষা করার প্রয়োজনই থাকে না।

এইবার দেখা যাক্ এম্-বুরোর কি বলিবার আছে। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ বিশেষভাবে ফরাসীদেশের ভিতরেই নিবদ্ধ। কিন্তু ফরাসী দেশ বলিতে অনেকখানি বুঝায়। ফ্রান্স দুনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এবং যে-সব পদ্ধতি ফ্রান্সে ব্যর্থ হইয়াছে অন্য কোথাও তাহা সার্থক হইবার সম্ভাবনা নাই।

'ব্যর্থ'—এই কথাটির অর্থ লইয়া মতভেদ হইবার আশঙ্কা আছে। সেই জন্য যে-অর্থে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমি খোলাসা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। পদ্ধতিগুলি ব্যর্থ হইয়াছে এ-কথা তখনই বলা যায়, যদি

দেখান যায় যে, উহার ফলে নৈতিক বন্ধন শিথিল হইয়াছে, স্বৈরাচার বাড়িয়াছে, এবং স্বাস্থ্য ও পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য নর-নারীর ভিতর সংযম না আসিয়া প্রধানতঃ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই সে গুলি ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এটি হইতেছে অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার কথা। চরমতম নৈতিক অবস্থায় নিরোধ-পদ্ধতির ব্যবহার যে কোন ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। কারণ লোকবৃদ্ধির উদ্দেশ্য ছাড়া নর-নারীর যৌন-সম্মিলনের কোন প্রয়োজনই নাই। দেহরক্ষার জন্য যে খাদ্য প্রয়োজন তাহা ছাড়া যেমন অন্য খাদ্য অনাবশ্যক, ইহা ততোধিক অনাবশ্যক। ইহা ছাড়া একটা তৃতীয় অবস্থাও আছে। একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন, 'নৈতিক-চরিত্র' নামে কোনও একটা জিনিষ নাই, অথবা যদি থাকে তবে তাহা সংযমের ভিতর নাই, আছে ইন্দ্রিয় ক্ষুধার পরিতৃপ্তিতে। এই ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যই ইন্দ্রিয় সমূহ তৈরী। দেহের ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়া এই পরিতৃপ্তির পথে যদি বাধার সৃষ্টি না করে, তবে ইন্দ্রিয়ভোগে আপত্তি করিবারও হেতু নাই।' এই চরমতর অবস্থার জন্যই আমার মনে হয় না, এম-বুরো তাঁহার এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কারণ তিনি টম্‌ম্যানের যে কথাটি দিয়া তাঁহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন তাহা হইতেছে—'ভবিষ্যৎ সেই জাতিরই হাতে, যে জাতি জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্র।'

এম-বুরোর এই গ্রন্থের প্রথমভাগে যে সমস্ত ঘটনাবলী সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পড়িয়া মন একেবারে দমিয়া যায়। যাঁহারা কেবল মানুষের ঘৃণ্যতম প্রবৃত্তিগুলি লইয়া কারবার করে, ফ্রান্সে তাহাদের কত বড় বড় সঙ্ঘ যে গড়িয়া উঠিয়াছে, এই অংশে তাহাই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ-নিরোধের যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা বলেন যে, এই উপায়ে

দ্বারা ভ্রুণ-হত্যা নিবারিত হইবে। কিন্তু দেখা যায় যে, ইহার দ্বারা এ ফলটাও লাভ করা যায় না। এম-বুরো বলেন—"গত ২৫ বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সে গর্ভ-সঞ্চার বিরোধী পদ্ধতি সমূহ অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিশ্চিত রূপে দেখা যাইতেছে যে, ভ্রুণ-হত্যার মাত্রা কমে নাই।" তাঁহার মতে ভ্রুণ-হত্যার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই ভ্রুণ-হত্যার সংখ্যা তাঁহার হিসাবে সেখানে বৎসরে ২,৭৫,০০০ হইতে ৩,২৫,০০০ ভিতরে। জন-সাধারণ পূর্ব্বে যে ভীতির সঙ্গে এগুলি নিরীক্ষণ করিত, এখন আর তাহাও করে না।

২

এম-বুরো বলেন—"গর্ভপাতের এই প্রবাহ হইতেই শিশু-হত্যা, বিচার বিহীন ব্যভিচার এবং সেই সব অপরাধও আসে, যাহা প্রকৃতিকে উৎপীড়িত করিয়া তোলে। শিশু-হত্যা অপরাধটি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে নূতন কিছুই বলিবার নাই। সে সম্বন্ধে কেবল এই মাত্রই বলা যায় যে, অবিবাহিত মাতাদিগকে সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, গর্ভ-নিরোধ ও গর্ভ-পাতের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অপরাধটি বাড়িয়াই উঠিতেছে। এখন আর ইহা তথাকথিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভিতর ঘৃণারও উদ্রেক করে না এবং জুরীরাও বিচারের সময় সাধারণতঃ নিরপরাধ এই রায়ই প্রদান করিয়া থাকেন।"

এম-বুরো অশ্লীল সাহিত্যের প্রচারের আলোচনায় একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় ব্যয় করিয়াছেন। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কাম ও অপবিত্র উদ্দেশ্য লইয়াই ইহাদের উৎপত্তি। চিত্তের তৃপ্তি এবং বিশ্রামের জন্য সাহিত্য, নাটক, চিত্র প্রভৃতির যে সব সম্পদ মানুষের হাতে আছে উহা তাহার অপব্যবহার করিতেছে।" তিনি আরও বলেন—"যে সমস্ত জিনিষ লইয়া ইহা কারবার করে তাহার প্রত্যেকটির একটা চাহিদাও গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিচালকদের উদ্ভাবনী-শক্তি, চমৎকার সংঘ-ব্যবস্থা, অজস্র মূলধন, এবং প্রযুক্ত-পদ্ধতিগুলির অননুকরণীয় পূর্ণতা প্রভৃতির দিকে নজর দিলে ইহার প্রসারেরও পরিচয় পাওয়া যায়।" "ইহা যে অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এত জোরালো, এত নূতন ধরণের যে, জন-সাধারণের সকলেরই মনোরাজ্যের জীবন উহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।" ফলে "একটা গৌণ-

ধরণের যৌন-জীবন, যাহা কেবল কল্পনার ভিতরেই ছিল তাহাও বাস্তবরূপ গ্রহণ করিয়াছে।”

ইহার পর এম-বুরো এম-রুসেনের রচনা হইতে একটি করুণ অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। অংশটি এই :—

“সমস্ত অশ্লীল সাহিত্য মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারেই অসংখ্য পাঠকের উপর অত্যন্ত জোরালো প্রলোভনের জাল বিস্তার করে। এই সাহিত্যের বহুল প্রচার হইতেই বোঝা যায়, যাহারা কল্পনায় গৌণ ভাবে যৌন-জীবন যাপন করে তাহাদের সংখ্যা অপরিমিত। পাগলা গারদে যাহারা বাস করে তাহাদের কথা বলিতেছি না, আমাদের কথাই বলিতেছি। আমাদের এই যুগে আমাদের চারিপাশেও সংবাদপত্রের এবং গ্রন্থাদির অনাচার সমস্ত অবস্থার মধ্যেই এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক লোক আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে, নিজেকে এবং বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সমূহকে ভুলিয়া যাইতে পারে। ডব্লিউ জেমস্ এই অবস্থাকে ‘নিম্নতম জগতের অনুরাগ’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।”

এই যে শোচনীয় পরিণাম—ইহা একটা মূলগত ভুলেরই ফল। যৌন-অসংযম যৌন-প্রয়োজনেই মানুষের পক্ষে আবশ্যক, এবং ইহা ছাড়া নর-নারী কেহই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে পারে না—এইরূপ একটা ধারণা হইতেই ইহার উদ্ভব। এরূপ ধারণা যে মুহূর্ত্তে মানুষের ভিতর আসে, সে তখনি এক সময়ে যাহা পাপ বলিয়া মনে করিত তাহাই পুণ্য বলিয়া মনে করিতে থাকে। তাহার পর হইতে যে সমস্ত ব্যাপার পশু-প্রবৃত্তির উদ্রেক করে এবং তাহা চরিতার্থ করিতে সাহায্য করে তাহার সংখ্যা বাড়িতে থাকে, অবশেষে তাহার আর সীমা-শেষ থাকে না।

ইহার পর দৈনিক ও সাময়িক পত্র, পুস্তিকা ও উপন্যাস, ফটোগ্রাফ ও নাট্যশালা প্রভৃতি মানুষের রুচি যে কি ভীষণ ভাবে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, এম-বুরো একটি অধ্যায় লিখিয়া তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহা অবিবাহিত নর-নারীর সম্পর্কে, তাহাদেরই নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে। এম-বুরো অতঃপর বিবাহিত নর-নারীর নৈতিক অধঃপতনের পরিমাপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"অভিজাত সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং কৃষক সম্প্রায়—ইহাদের অধিকাংশই আত্মম্ভরিতা এবং অর্থলিপ্সার জন্য বিবাহ করেন।" "বড় পদ পাইবার জন্য, দুইটি সম্পত্তি—বিশেষভাবে দুইটি জমিদারী যুক্ত করিবার জন্য, পূর্ব্বের সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য, অবৈধ পুত্রকে বৈধ করিবার জন্য, বৃদ্ধ বয়সে আধি-ব্যাধিতে শুশ্রূষা পাইবার জন্য, বলপূর্ব্বক যখন সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় তখন সৈন্যদল হইতে মুক্তি লাভের জন্য—এই-সব কারণেই অধিকাংশ লোক বিবাহ করে। তাহা ছাড়া পাপের জীবনে যখন বিরক্তি আসে তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য ও যৌন-জীবনের পরিবর্ত্তে অন্য একটি জীবন গ্রহণের জন্যও অনেকে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে।"

ইহার পর এম-বুরো উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এই সব বিবাহ স্বৈরাচার না কমাইয়া বরং তাহা বাড়াইয়া থাকে। যে-সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যৌন-মিলনের ফললাভে বাধা দেয় অথচ মিলনে বাধা দেয় না, এই অধঃপতন সেই সব আবিষ্কার দ্বারাই প্রভূত ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমবর্দ্ধমান ব্যভিচার এবং আইন-অনুমোদিত বিবাহচ্ছেদের

বিস্ময়কর বর্ণনাগুলি যে অংশে আছে আমি তাহার করুণ কাহিনী লইয়াই আলোচনা করিব না। গত ২০ বৎসরে বিবাহচ্ছেদের ব্যাপার দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে কেবল এই কথারই উল্লেখ করিতে চাই যে, উভয় সম্প্রদায় নৈতিক নীতির একই আদর্শ অনুসরণ করায়, নারী-জাতিরও অসংযমের দিকে অপ্রতিহত স্বাধীনতা বাড়িয়া চলিয়াছে। গর্ভ-নিরোধ পদ্ধতিগুলির এবং গর্ভ-নিপাতের ব্যবস্থাগুলির পরিপূর্ণতা স্ত্রী-পুরুষকে সমান ভাবে নৈতিক সংযম সম্বন্ধে বেপরোয়া করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহটাকেই যে উপহাস করা হয় তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। একজন জন-প্রিয় লেখকের লেখা হইতে এম-বুরো নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—"আমার বিচারে যতগুলি অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হইয়াছে, বিবাহ তাহার মধ্যে চরমতম অসভ্য অনুষ্ঠান। মানব জাতি যদি ন্যায় এবং যুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, তবে ইহা যে উঠিয়া যাইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু পুরুষ এতই হীন এবং রমণী এতই ভীরু যে, যে-আইন তাহাদিগকে শাসন করিতেছে তাহা হইতে মহত্তর আইনের দাবী করিতেও তাহারা সাহস পায় না।"

এম-বুরো যে-সব পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে-সব যুক্তি দ্বারা এই সব পদ্ধতিকে সমর্থন করা হয় তাহার ফল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। তিনি বলেন—"এই নৈতিক অসংযমের প্রবাহের দ্বারা আমরা এক নূতন পথে অগ্রসর হইতেছি। সে পথ কি? সে পথ দিয়া যে ভবিষ্যৎ আমাদের সাম্‌নে আসিতেছে তাহার ভিতর কি আছে—উন্নতি, আলো, সৌন্দর্য্য; আত্মার বিকাশের সম্ভাবনা? না সে পথে আমাদের কাছে আসিতেছে অধঃপতন, অন্ধকার, কুৎসিত বিকৃতি এবং ধ্বংস? যে

অসংযম প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তাহার ভিতর কি সেই বিপ্লবের ছাপ আছে· যাহা প্রাচীন নিয়ম ধ্বংস করিয়া সমাজকে সার্থক ও প্রাণবন্ত করিয়া তোলে? এ কি সেই বিদ্রোহ, নূতন যুগের জাগরণের বীজ বহন করিয়া আনার জন্য যাহাকে ভবিষ্যৎ সমাজ কৃতজ্ঞ চিত্তে অভিনন্দিত করিবে! অথবা ইহার ভিতর দিয়া আদি-মানবের সেই বিদ্রোহই আমাদের ভিতর জাগিয়া উঠিতেছে, যাহা সেই সব নিয়মের বন্ধনই ছিন্ন করিতে চায় যে-সব নিয়ম-পালনের উপরে নির্ভর করে আমাদের চিত্তের পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি দমনের শক্তি। সংযত নিরাপদ জীবনকেই বিপন্ন করিয়া তুলিবার জন্য একটা কুৎসিৎ বিদ্রোহ কি আজ আমাদের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই?"

ইহার পর এম-বুরো অজস্র উদাহরণ দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত যে ফল পাওয়া গিয়াছে, সমস্ত দিক দিয়া তাহা একান্ত ভাবেই শোচনীয় হইয়াছে। তাহা আমাদের জীবনকেও বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

৩

বিবাহিত লোক যখন নৈতিক সংযমের দ্বারা সন্তানোৎপাদনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে সে এক জিনিষ হয়, আর যখন ইন্দ্রিয়কে যথেচ্ছভাবে পরিচালনা করিয়া, কৃত্রিম গর্ভ-রোধের প্রণালী অবলম্বনের দ্বারা তাহারা সন্তান উৎপাদন বন্ধ করে তখন তাহা আর এক জিনিষ হয়। একটি দ্বারা সর্ব্বপ্রকারেই শুভ হয়, অন্যটির দ্বারা ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এম-বুরো হিসাব-নিকাশ খতাইয়া এবং হ্রাস-বৃদ্ধির নক্‌সা ছকিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, রিপুর অসংযত পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে তাহার ফল প্রতিরোধের চেষ্টায় গর্ভ-নিরোধ-প্রণালীগুলির ব্যবহারে জন্মের সংখ্যা মৃত্যুর সংখ্যা হইতে ঢের হ্রাস পাইয়াছে। কেবল প্যারিসে নহে, সমগ্র ফ্রান্সেই এই অবস্থা দেখা দিয়াছে। ফরাসী দেশ ৮৭টি জেলায় বিভক্ত। এই ৮৭টি জেলার ভিতর ৬৮টিতেই মৃত্যুর হার জন্মের অপেক্ষা বেশী। 'লট্' নামক স্থানে যদি মরে ১৬২ জন জন্মগ্রহণ করে ১০০ জন। 'ট্রন্-এট-গারোন্নিতে' মৃত্যুর হার ১৫৬, জন্মের হার ১০০। এমন কি যে ১৯টি জেলায় জন্মের হার মৃত্যুর হার অপেক্ষা বেশী তাহার কয়েকটিতেও পার্থক্য এত সামান্য যে, তাহা অনায়াসেই উপেক্ষা করা যায়। কেবলমাত্র ১০টি জেলায় এই পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। 'মোরবিহান' এবং 'পাস-ডি-কালে' নামক দুইটি জেলায় মৃত্যুর হার ৭২ এবং জন্মের হার ১০০। এম-বুরো এই অবস্থার নাম দিয়াছেন 'স্বেচ্ছা-বৃত মৃত্যু' এবং তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে,

জনহীন করিবার এই প্রথাকে বাধা দেওয়ার কোনও পথই অবলম্বন করা হয় নাই।

অতঃপর এম-বুরো ফ্রান্সের প্রদেশগুলির অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া এম-জাইড্ ১৯১৪ সালে নরম্যাণ্ডি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

"গত ৫০ বৎসরে 'নরম্যাণ্ডি' তাহার ৩,০০,০০০ অধিবাসীকে খোয়াইয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত 'ওর্ণে যত লোকের বাস তত লোককে খোয়াইয়াছে। প্রত্যেক বিশ বৎসরে একটি বিভাগে যত লোক বাস করে তত লোক তাহার ধ্বংস হয়। 'নরম্যাণ্ডি' ৫টি বিভাগে বিভক্ত। সুতরাং ১০০ বৎসরের ভিতরেই অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইবে যে, তাহার বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রে ফরাসী জাতিকে আর দেখা যাইবে না। 'ফরাসী জাতি' কথাটা আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই ব্যবহার করিয়াছি। কারণ শূন্য স্থানগুলি অধিকার করিবার জন্য অন্য জাতি নিশ্চয়ই আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং যদি না আসে তবে তাহা আরও ক্ষোভের কারণ হইবে। 'কায়েনের' লৌহ খনিতে জার্ম্মানেরা কাজ করিতেছে এবং এই প্রথম গতকল্য এক দল চীনা শ্রমিক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে, যেখান হইতে 'উইলিয়াম-দি-কঙ্কারার' ইংলণ্ডে যাত্রার জন্য জাহাজে উঠিয়াছিলেন।" এই উক্তির উপরে মন্তব্য করিতে গিয়া এম-বুরো বলিয়াছেন—"এমন আরও কত প্রদেশ আছে যাহার অবস্থা ইহা অপেক্ষা অনুমাত্রও ভাল নহে।"

ইহার পর তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, জন-সংখ্যার এই অধোগতি জাতির সামরিক শক্তিকেও নিঃসংশয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। তাঁহার

বিশ্বাস, এই জন্যই অতি অল্পসংখ্যক লোক আজকাল ফ্রান্স হইতে বিদেশে গমন করে। ফ্রান্সের ওপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রসার বন্ধ হওয়া, তাহার বাণিজ্য, ভাষা, এবং কৃষ্টির গতি রুদ্ধ হওয়া—এ-সমস্তের মূলেও যে এই কারণ রহিয়াছে এম-বুরো তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

অতঃপর এম-বুরো প্রশ্ন করিয়াছেন—"প্রাচীন যৌন-সংযম ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দেওয়ায় ফরাসী জাতির সুখ, সম্পদ, স্বাস্থ্য, জ্ঞান-জাত কৃষ্টি প্রভৃতি বাড়িয়াছে কি ?" প্রশ্নের উত্তরে তিনিই বলিয়াছেন—"স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্বন্ধে দুই-একটি কথাই যথেষ্ট। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে-সব যুক্তি আছে তাহার প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা আমাদের ভিতর যতই তীব্র হউক্ না কেন, এ-কথা বলা খুব শক্ত যে, এই স্বাধীনতা শরীরকে সবল করে এবং স্বাস্থ্যকে উন্নত করে। সব দিক হইতেই শোনা যায় যে, বালকেরা এবং যুবকেরা তাহাদের তেজ ও স্ফূর্ত্তি হারাইয়া ফেলিতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নব-গঠিত সৈন্যদের দৈহিক শ্রমের পরিমাণ পুনঃ পুনঃ কমাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমগ্র জাতির সহ্য-শক্তিই যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। নৈতিক সংযমের অভাবকেই ইহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অবশ্য অবিচার করা হইবে। মদ্যপান, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস ইত্যাদি অনেক কারণ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে একটা বড় কারণ তাহাতেও সন্দেহ নাই। বিশেষ হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই অসংযম এবং যে মনোভাব এই অসংযমে চিত্তকে প্ররোচিত করে সেই মনোভাবই অন্যান্য অভিশাপগুলিকে প্রশ্রয় দেয়—তাহাদের সহায়তা করে। * * *

উপদংশ প্রভৃতি ব্যাধির ভয়াবহ প্রসার সাধারণের স্বাস্থ্যের অপরিসীম ক্ষতি করিতেছে।"

মেলথাস্-পন্থীরা বলেন—যে-সমাজ জন্মের ধারা নিয়ন্ত্রিত করে, তাহার সম্পদ সেই মাত্রায় বাড়িয়া উঠে যে-মাত্রায় জন্মের হারকে রোধ করা হইয়াছে। এম-বুরো এই মতবাদেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর জন্ম হারের এবং জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধির সহিত ফ্রান্সের জন্ম ও সম্পদ হ্রাসের তুলনামূলক উদাহরণের দ্বারা তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এ-মতবাদ সত্য নহে। এম-বুরো আরও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর বাণিজ্যের এই বিপুল বিস্তার তাহার শ্রমিকদের স্বার্থের বিনিময়ে অর্জ্জিত হয় নাই—অন্ততঃ পক্ষে অন্য স্থানের শ্রমিকদের স্বার্থের অপেক্ষা জার্ম্মাণীতে তাহাদের স্বার্থ বেশী পরিমাণে ব্যাহত হয় নাই। এম-রোজিনোলের লেখা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—"জার্ম্মাণীতে লোকের সংখ্যা যখন ৪,১০,০০,০০০ ছিল তখন তাহারা অনশনে মারা গিয়াছে। তাহার পর তাহার সম্পদ ঢের বাড়িয়াছে, লোক সংখ্যাও বাড়িয়া ৬,৮০,০০,০০০ হইয়াছে!" তিনি আরও বলেন —"এই লোকগুলি সন্ন্যাসী ছিল না। সুতরাং তাহারা 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে' অর্থ জমা দিত। ১৯১১ সালে এই অর্থ ২২০০ কোটি ফ্রাঙ্কে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ১৮৯৫ সালে এই জমার অঙ্কটি ছিল মাত্র ৮০০ কোটি ফ্রাঙ্ক। সুতরাং তাহাদের সম্পদের পরিমাণ বাড়িয়াছে বৎসরে ৮৫ কোটি ফ্রাঙ্ক হিসাবে।"

নিম্নলিখিত অংশটিতে এম-বুরো জার্ম্মাণীর যান্ত্রিক উন্নতির বর্ণনা করিয়া তাহাদের সাধারণ কৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। অংশটি চিত্তাকর্ষক :—

"সমাজতত্ত্বের ভিতর গভীর ভাবে প্রবেশ না করিয়াও এ-কথা বোঝা যায় যে, শ্রেষ্ঠতর ধরণের শ্রমিক, উচ্চশিক্ষিত যন্ত্র-চালক এবং সম্পূর্ণ সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া না গেলে এইরূপ যান্ত্রিক উন্নতি কখনও সম্ভবপর হইত না, কারণ ইহা অত্যন্ত সহজ কথা। * * * শিল্প-বিদ্যালয়গুলি তিন প্রকারের। পেশাদারী স্কুলগুলির সংখ্যা ৫০০ এবং ছাত্র সংখ্যা ৭০,০০০। যন্ত্র-বিজ্ঞান-শিক্ষাগারের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। ইহাদের কোনও কোনওটিতে ১০০০ ছাত্রও শিক্ষা লাভ করে। তাহা ছাড়া কলেজও আছে—এগুলিতে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৫,০০০ ছাত্র এই সব কলেজে শিক্ষা পায়। এই শিক্ষায়তন হইতে 'ডাক্তার' উপাধি বিতরণ করা হইয়া থাকে। * * * বাণিজ্য বিষয়ক স্কুলের সংখ্যা ৩৬৫টি। এগুলিতে ৩১,০০০ ছাত্র পড়াশুনা করে। ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য বিদ্যালয় আছে যাহাতে ৯০,০০০ ছাত্র শিক্ষা পায়। জার্ম্মাণীর ধনোৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় এইরূপে ৪,০০,০০০ ছাত্র নিযুক্ত আছে। এই বিরাট ছাত্র-বাহিনীর সহিত আমাদের পেশাদারী স্কুলগুলিতে যে ৩৫,০০০ মাত্র ছাত্র পড়াশুনা করে তাহাদের কি তুলনা করা চলে? এ-দেশের ১৭,৭০,০০০ লোক কৃষিজীবী। ইহাদের ভিতর ৭,৭৯,৭৯৮ জনের বয়স ১৮ বৎসরেরও কম। অথচ বিশেষ কৃষি-বিদ্যালয়গুলিতে মাত্র ৩,২২৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে।"

জার্ম্মানীর এই অদ্ভুত অভ্যুত্থানের একমাত্র কারণ যে তাহার মৃত্যুর হার অপেক্ষা জন্ম-হারের বৃদ্ধি নহে, তাহা এম-বুরো স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যখন বলেন—অন্যান্য ব্যবস্থা প্রতিকূল না হইলে জন্মহারের বৃদ্ধি জাতীয় উন্নতির অপরিহার্য্য কারণ স্বরূপই হয়, তখন তাহার ভিতরেও যুক্তি

আছে। বস্তুতঃ তিনি যে-সত্য প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন তাহা এই যে, জন্মের হারের বৃদ্ধি পার্থিব উন্নতি এবং নৈতিক উন্নতির পরপন্থী নহে। জন্মহারের দিক দিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা অবশ্য ফ্রান্সের অনুরূপ নহে। কিন্তু একথা বলা যায় যে, ভারতের জন্ম-সংখ্যার অতি-বৃদ্ধি জার্ম্মানীর মত আমাদের জাতীয় উন্নতির বাহন হইতে পারে নাই। কিন্তু এ সমালোচনা এখানে অনাবশ্যক। কারণ এম-বুরোর হিসাব-নিকাশ ও সিদ্ধান্তের কষ্টি-পাথরে কষিয়া ভারতের অবস্থা আমরা আর একটি অধ্যায়ে যাচাই করিয়া দেখিব।

যে-জার্ম্মাণীতে মৃত্যুর হার জন্মের হারের অপেক্ষা বেশী সেই জার্ম্মাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এম-বুরো বলিতেছেন—"আমরা জানি যে, জাতীয় সম্পদের দিক হইতে ফ্রান্সের স্থান জগতে চতুর্থ। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। টাকা খাটাইয়া ফ্রান্স বৎসরে ২৫০০ কোটি ফ্রাঙ্ক লাভ করে, কিন্তু জার্ম্মাণীর লাভের পরিমাণ ৫০০০ কোটি ফ্রাঙ্ক। * * * ১৮৭৯ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসরে ফ্রান্সের জমির মূল্য ৪০০০ কোটি ফ্রাঙ্ক কমিয়াছে, অর্থাৎ যেখানে তাহার মূল্য হওয়া উচিত ছিল ৯২,০০ কোটি ফ্রাঙ্ক, সেইখানে তাহার মূল্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৫২,০০, কোটি ফ্রাঙ্কে। দেশের সমস্ত জেলাতেই জমিতে কাজ করিবার লোকের অভাব এবং এমন সব জেলাও আছে, যেখানে বৃদ্ধ ছাড়া অন্য লোক বিশেষ দেখাই যায় না।" তিনি আরও বলেন—"নৈতিক অসংযম এবং সুনিয়ন্ত্রিত বন্ধ্যাত্ব জাতির স্বাভাবিক শক্তি-ক্ষয়ের পরিচয়ই প্রদান করে এবং সামাজিক জীবনে বৃদ্ধদের অপ্রতিহত প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত করে। * * * ফ্রান্সে প্রতি হাজার লোকের ভিতর শিশুদের সংখ্যা মাত্র ১৭০

জন, কিন্তু জার্ম্মাণীতে এই সংখ্যা ২২০ এবং ইংলণ্ডে ২১০। * * * বৃদ্ধদের সংখ্যা যাহা হওয়া উচিত অনুপাতে ফ্রান্সে তাহাদের সংখ্যা তাহা হইতে বেশী এবং যাঁহারা বয়সে বৃদ্ধ নহেন, অথচ নৈতিক অনাচার ও স্বেচ্ছাকৃত জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতর সেই সব কাপুরুষতা প্রচুর পরিমাণে দেখা দিয়াছে যাহা শক্তিহীন জাতির পক্ষে অপরিহার্য্য।"

অতঃপর গ্রন্থকার বলিতেছেন—"আমরা জানি যে, ফরাসী জাতির অধিকাংশ লোকই তাহাদের শাসকদের পারিবারিক জীবনের এই নৈতিক দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে উদাসীন। ইহার মূলে রহিয়াছে সেই নীতি যে নীতি বলে—ব্যক্তিগত জীবনে সকলেই স্বাধীন।" তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এম-লিওপোল্ড মোনোডের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন:— "অসঙ্গত অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য যুদ্ধে যাওয়া এবং যাহারা দুঃখ ভোগ করে তাহাদের দুঃখের শৃঙ্খল মোচন করা খুব ভাল জিনিষ। কিন্তু সেই সকল লোক যাহারা বিবেককে প্রলোভনের হাত হইতে মুক্ত রাখিতে শেখে নাই, যাহাদের সাহস মুহূর্ত্তের খেয়াল বা ক্রোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যাহারা যৌবনের পবিত্র ক্ষণে পত্নীর নিকট যে শপথ করিয়াছে তাহা ভঙ্গ করে এবং তাহার জন্য লজ্জাবোধ করে না বরং গৌরব অনুভব করে, যাহারা অত্যধিক আত্মপ্রীতির দ্বারা গৃহে অশান্তি ও অত্যাচারের স্রোত বহায়, মুক্তি দানের শক্তি তাহাদের কোথায়?"

ইহার পর গ্রন্থকার বলিতেছেন:—

"এইরূপে আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, আমরা দেখিতে পাই যে, নানা প্রকারের নৈতিক অসংযম ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে

অত্যন্ত পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে এবং আমাদের দুঃখ অবর্ণনীয় করিয়া তুলিয়াছে। যুবকদের স্বৈরাচার, বেশ্যাবৃত্তি, অশ্লীল সাহিত্যের প্রচার, অর্থের জন্য বিবাহ, অহঙ্কার, বিলাসিতা, ব্যভিচার, বিবাহ-বিচ্ছেদ, স্বেচ্ছাকৃত বন্ধ্যাত্ব ও গর্ভপাত—এগুলি জাতিকে শক্তিহীন করিতেছে, এবং তাহার জন-সংখ্যার বৃদ্ধি বন্ধ করিতেছে। মানুষ তাহার নিজের শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিতেছে না এবং জন্ম-সংখ্যার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যাহারা নূতন জন্মাইতেছে, তাহারাও ক্ষীণ-শক্তি হইয়া পড়িতেছে। 'জন্ম সংখ্যার হ্রাসের ফল—শ্রেষ্ঠতর মানুষের জন্ম' বলিয়া একটা কথা আছে। এই কথাটা তাঁহাদের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যাঁহারা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের একটা অন্ধ ধারণা বশতঃ মনে করেন যে, মানুষও ঘোড়া-ভেড়ার মত একই ভাবে সন্তান উৎপাদন করিবে। ইঁহাদের সম্বন্ধেই অগস্ত কোম্‌তে তীব্রভাবে এই কথাই বলিয়াছেন যে, আমাদের সামাজিক ব্যাধির এই সব তথা কথিত চিকিৎসকদের পশু চিকিৎসক হওয়াই উচিত ছিল। কারণ ব্যক্তি এবং জাতির মনস্তত্ত্বের ভিতর যে বিরাট জটিলতা রহিয়াছে তাহা বুঝিবার শক্তি ইঁহাদের নাই।"

"এ-কথা খাঁটি সত্য যে, মানুষের যৌন-ক্ষুধা সম্পর্কে যে মনোভাব, সিদ্ধান্ত এবং অভ্যাস গড়িয়া উঠে, তাহা তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যত বেশী প্রভাব বিস্তার করে, তাহার আর কোন মনোভাব, সিদ্ধান্ত, বা অভ্যাস ততটা করিতে পারে না। এমন কি ইহার সহিত অন্য কোনও ব্যাপার-সম্পর্কিত অভ্যাস, মনোভাব ও সিদ্ধান্তের তুলনাই হয় না। এগুলিকে সে সংযতই করুক, অথবা ইহাদের দ্বারা পরাজিতই হোক্, তাহার কাজ দূরতম সমাজ জীবনেও প্রতিধ্বনি জাগায়। কারণ

প্রকৃতির নিয়মই এই যে, কাজ যত গোপনেই করা হোক্ না কেন, তাহা অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত তুলিবেই।"

"যখনই আমরা কোনো নৈতিক সংযমের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করি, আমরা এই মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চাই যে, আমাদের দুষ্কার্য্যের ফলে কোনরূপ গুরুতর অন্যায় দেখা দিবে না। প্রথমতঃ আমাদের নিজের দিক হইতে আমরা খুশীই থাকি। কারণ নিজেদের স্বার্থ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ইচ্ছায়ই আমাদিগকে কাজে অনুপ্রেরণা দেয়। তারপর যখন সমাজের দিক দিয়া বিবেচনা করিবার সময় আসে তখন মনে হয়, আমরা এত ক্ষুদ্র এবং আমাদের সমাজ এত বড় যে, আমাদের দুষ্কার্য্য ইহার নজরেই আসিবে না। তাহা ছাড়া আমরা মনে মনে একথাও ভাবি যে, আমরা যাহাই করি না কেন, অন্য সকলে পবিত্রই থাকিবে—তাহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের কাজ ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত এই কাপুরুষোচিত হিসাবটাই সাধারণতঃ সত্য হয় এবং এই সাফল্যের গর্ব্বে এই মনোভাবই আমাদের মনে ধীরে ধীরে স্থায়ী হইয়া যায়। অবশেষে এমনও হয় যে, ইহাকেই আমরা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে থাকি। ইহাই মানুষের চরম দণ্ড।"

"কিন্তু এমন সময়ও আসে যখন এই সমস্ত কাজের দৃষ্টান্তে আমাদের অন্যান্য কর্ত্তব্যেও নানারকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যেক অন্যায়, ধর্ম্মের প্রতি সেই আকর্ষণকেই শিথিল ও জটিল করিয়া তোলে, যে-আকর্ষণ সব মানুষের ভিতর থাকা আমরা সহজ বলিয়া মনে করি। এবং আমাদের প্রতিবেশীরাও প্রবঞ্চিত হইতে হইতে অবশেষে

দ্রুত গতিতে আমাদেরই অনুসরণ করিতে থাকেন। অধঃপতন সেইদিন হইতেই সুরু হয়। ইহার পর আমাদের অন্যায়ের পরিমাপ এবং আমাদের দায়িত্বের গুরুত্বের পরিমাপ সহজেই করা যায়। * * * *

"গোপন কার্য্য সকল যেখানে বন্ধ থাকিবে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহা আর সেখানে আবদ্ধ থাকে না, গুপ্ত স্থান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে। রেডিও শক্তির মত ইহারও একটা দেহহীন-শক্তি আছে। সমাজের সমস্ত স্তরে সেই শক্তি ছড়াইয়া পড়ে। প্রত্যেকের অন্যায়ের জন্য আমাদের প্রত্যেককে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কারণ আমাদের কাজের প্রভাব আবর্ত্ত হইতে উত্থিত ঢেউয়ের মত। সামাজিক জীবনের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার শক্তি অনুভূত হয়। * * *

"নৈতিক অসংযম জাতির জীবন-উৎসকে শুকাইয়া ফেলে, এবং তরুণদের ধ্বংসের গতিকে দ্রুততর করিয়া তোলে। তাহাদের দেহ এবং মন উভয়ের শক্তিকেই নষ্ট করিয়া দেয়।"

৪

নৈতিক অসংযম, গর্ভ-নিরোধ ব্যবস্থার দ্বারা দুর্নীতির প্রসার এবং তাহার ভীষণ পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করার পর গ্রন্থকার ইহার প্রতিকারের পথগুলিও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার যে-অংশে আইনের বিধি, তাহার প্রয়োজনীয়তা, অথচ তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থার দৈন্যের সম্বন্ধে আলোচনা আছে, সে-অংশের কথা বাদ দিয়া যাইতেছি। অবিবাহিত লোকদের পক্ষে সংযম কেন প্রয়োজন, বিপুল জন-সঙ্ঘের যাহারা পশু-প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে বিবাহিত হওয়ার আবশ্যকতা কোথায়, দাম্পত্য জীবনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা কি এবং বিবাহিত জীবনেও সংযম কেন দরকার—এই সব সম্পর্কে জনমত গঠনোপযোগী শিক্ষা সম্বন্ধে অতঃপর তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহার বিধি-নিষেধ নর-নারীর মনস্তত্ত্বের বিরোধী এবং ফলে ইহার দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের আনন্দময় সামঞ্জস্যের হানি হয়। এবং ইহাও বলা হয় যে, ইহার দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে অন্যায় ভাবে আক্রমণ করা হয় এবং তাহার নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করার এবং আনন্দভোগের অধিকারকে খর্ব্ব করা হয়। এই যুক্তিগুলিকেও বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে।

'জননেন্দ্রিয়ও অন্যান্য সকলের মতই আত্মতৃপ্তি চায়'—গ্রন্থকার এই মত অস্বীকার করেন। তিনি বলেন—জননেন্দ্রিয়ও যদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মত হইত, তবে ইহাকে দমন করিবার যে অবাধ শক্তি আমাদের ইচ্ছার আছে

তাহার অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বালক-বালিকারা তাহাদের স্বাভাবিক যৌবন লাভের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান সভ্যতা তাহাদের সম্মুখে অজস্র উত্তেজনার বস্তু আনিয়া উপস্থিত করে। এইভাবে তাহাদের ভিতর যৌন-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। অথচ ভণ্ড সমাজবাদীরা ইহাকেই যৌন-প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ আমাদের জননেন্দ্রিয় ভোগ-পিপাসু—এ তথ্যের ভিতর সত্য কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আত্মসংযম হানিকর তো নহেই, তাহা যে প্রয়োজনীয় বস্তু, স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই যে তাহার প্রয়োজন, এবং সংযম যে সম্পূর্ণরূপে সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার তাহা প্রমাণের জন্য গ্রন্থ-মধ্যে অনেকগুলি মূল্যবান ডাক্তারী প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রমাণগুলি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ আমি পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

'টুবিগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে'র অধ্যাপক অষ্টার্লেন বলেন—"কামানুভূতি এত অন্ধ ও বিপুল বলশালী নহে যে, তাহাকে সংযত করা যায় না। নৈতিক বল ও বিবেকের সাহায্যে ইহাকে সম্পূর্ণ ভাবেই পরাজিত করা যায়। উপযুক্ত সময় না আসা পর্য্যন্ত যুবক-যুবতীদের আত্মসংযম করিয়া চলা দরকার। তাহাদের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, এই স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগের পুরস্কার হইতেছে অটুট স্বাস্থ্য এবং অবিকৃত উৎসাহ।"

"ইন্দ্রিয় সংযম এবং অক্ষুণ্ণ পবিত্রতার সহিত দেহ-বিজ্ঞান ও নীতি-ধর্ম্মের বিরোধ নাই। নীতি ও ধর্ম্ম যেমন অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যার অনুমোদন করে না, তেমনি দেহ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানও তাহার অনুমোদন করে না।"

লণ্ডনের 'রয়াল কলেজের' অধ্যাপক স্যার ল্যাওনেল বিল বলেন—"শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম লোকদের উদাহরণ সর্ব্বকালে এই কথাটাই প্রমাণ করিয়াছে যে, অত্যন্ত উগ্র অনুভূতিও দৃঢ় এবং একাগ্র ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এবং সাবধানতার সহিত জীবন নিয়ন্ত্রণের ধারা ও জীবিকার্জ্জনের পদ্ধতির নির্ব্বাচনের দ্বারা সংযত করা যায়। বাহিরের বাধা দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে, স্বেচ্ছায় জীবন যাত্রার নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সেবাকে বর্জ্জন করেন, তাঁহাদের সেজন্য কখনই কোন ক্ষতি হয় না। বস্তুতঃ ব্রহ্মচর্য্য যখন মনের কোনও বিশেষ অবস্থার অভিব্যক্তি হয় তখন তাহাকে পালন করা অনুমাত্রও কঠিন নহে। যৌন-সম্ভোগ বন্ধ করা অর্থই ব্রহ্মচর্য্য নহে, চিন্তার শুদ্ধতা এবং গভীর বিশ্বাস হইতে যে-শক্তি অর্জ্জন করা যায় তাহাই ব্রহ্মচর্য্য।"

মিঃ ফোরেল সুইজারল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানবিৎ। তিনি যৌন-বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন—"সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক বৃত্তিই চর্চ্চার দ্বারা বৃদ্ধি পায় ও শক্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে বিশেষ কোনো অংশে স্নায়ুর কাজ বন্ধ রাখিলে উত্তেজনার কারণ কমিয়া যায়—তাহা সংযত করা হয়।"

"ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের সমস্ত কারণই ভোগের লালসা বাড়াইয়া তোলে। এই কারণগুলিকে যদি এড়ানো যায়, তবে ইন্দ্রিয় কম অনুভূতি-প্রবণ হইয়া পড়ে এবং ভোগের উন্মাদনাও ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসে। যুবকদের ভিতর এই ধারণাই প্রবল যে, ব্রহ্মচর্য্য একটা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্রহ্মচর্য্য যাহারা পালন করে তাহাদের দ্বারা এ [illegible] যে, স্বাস্থ্যের হানি না করিয়াও ইন্দ্রিয়কে

সংয

রিবিং বলেন—"২৫।৩০ বৎসরের এবং তাহা অপেক্ষাও বেশী বয়সের অনেককে আমি জানি যাহারা সম্পূর্ণ ভাবেই অথবা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে—কেবল তাঁহারা নিজেদের কথা বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করেন না।"

"যাঁহাদের দেহ ও মন সুস্থ এমন অনেক ছাত্রের সঙ্গে আমার পত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-ভোগ-লিপ্সা যে সহজেই দমন করা যায়—এ-কথাটা যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রচার না করার জন্য তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন।"

ডাক্তার একৃটন বলেন—"বিবাহের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যুবকদের পক্ষে প্রয়োজন বলিয়াও মনে করি, সম্ভব বলিয়াও মনে করি।"

ইংলিশ কোর্টের ডাক্তার স্যার জেমস্ প্যাগেট্ বলেন—"ব্রহ্মচর্য্য যেমন আত্মার ক্ষতি করে না, তেমনি দেহেরও ক্ষতি করে না। চরিত্র গঠনের পক্ষে সংযম অন্য সমস্ত উপায় হইতে শ্রেষ্ঠ।"

ডাক্তার ই-পেরিয়ার লিখিয়াছেন—"পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালনে ক্ষতি হয়—এইরূপ একটা কাল্পনিক আশঙ্কা অনেকের মনেই আছে। এই আশঙ্কা একেবারেই ভিত্তিহীন এবং এই ধারণার বিরুদ্ধে খুব জোরাল প্রতিবাদ হওয়াও সঙ্গত। কারণ এ-আশঙ্কা কেবল বালক-বালিকাদের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে না, তাহাদের পিতামাতার উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। যুবকদের পক্ষে সংযম—দৈহিক, নৈতিক এবং মানসিক—রক্ষা-কবচের ন্যায় কাজ করে।"

স্যার এণ্ড্রু ক্লার্ক বলেন—"ব্রহ্মচর্য্য ক্ষতি করে না, ইহা উন্নতিরও পরিপন্থী নহে। বরং ইহা শক্তিকেই বাড়ায় এবং বুদ্ধিকে প্রখর করে।

কাম-পরতন্ত্রতা আত্মসংযমের শক্তি নষ্ট করে, অভ্যাস শিথিল করিয়া তোলে, সমস্ত সত্ত্বাতেই একটা জড়তা এবং অধঃপতন আনিয়া দেয় এবং এমন সব রোগের সৃষ্টি করে যাহার জের কয়েক পুরুষকে পর্য্যন্ত টানিয়া চলিতে হয়। ইন্দ্রিয়-সেবা যুবকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন—একথা বলা কেবল ভ্রমাত্মক নহে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাও বটে। ইহা যেমন মিথ্যা তেমনি অনিষ্টকর।

ডাঃ সারব্লেড্ লিখিয়াছেন "ইন্দ্রিয় সেবায় যে হানি হয় তাহা সর্ব্বজন-বিদিত এবং অবিসম্বাদিত। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা হানি হয় এ-কথা কল্পনা-মাত্র। পূর্ব্বের মতটি যে সত্য তাহার প্রমাণ—বহু বিদ্বান লোকের দ্বারা এবং প্রভূত গ্রন্থের দ্বারা উহা সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত মতটি সমর্থন করিবার মত পণ্ডিত লোক এ-পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত মতটি সম্বন্ধে অস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র কথায় যে জিনিষকে সমর্থন করিতে গেলেও লজ্জায় আত্মগোপন করিতে হয়, তাহা প্রকাশ্য দিবালোক কথনও সহ্য করিতে পারিবে না।

ডাক্তার মণ্টেগজা La Physiologie de Pamour-এ লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা ব্যাধি উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ একটি দৃষ্টান্তও আমার চোখে পড়ে নাই। * * * সমস্ত মানুষই, বিশেষ ভাবে যুবকেরা সংযমের উপকার সঙ্গে সঙ্গেই লাভ করিতে পারেন।"

'বার্ণির' স্নায়ু-বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ ডুবয় বলেন—"যাহারা অবাধ ইন্দ্রিয় পরিচালনায় অভ্যস্ত তাহাদের অপেক্ষা যাহারা পশু প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে তাহাদের ভিতর স্নায়বিক ব্যাধি ঢের কম।" 'বিকেটার-হাঁসপাতালে'র চিকিৎসক ডাঃ ফিরিও এই মতকেই সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, যাঁহারা মানসিক সংযম রক্ষা করিতে

পারেন ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা তাঁহাদের স্বাস্থ্য হানি হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। ইন্দ্রিয়-ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করার উপরে স্বাস্থ্যের উন্নতি নির্ভর করে না।

অধ্যাপক আলফ্রেড্-ফোরনিয়ার বলেন—"তরুণদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা বিপদের আশঙ্কা আছে—এমনি ধরণের অযৌক্তিক হাল্কা কথা অনেককে বলিতে শুনা যায়। আমি আপনাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, যদি এরূপ কোনো বিপদ সত্যই থাকে, তবে তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই আছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বলিতে চাই যে, এরূপ বিপদ যে আছ তাহার কোনও প্রমাণ আমি এ-পর্য্যন্ত পাই নাই, থাকিলে আমার চিকিৎসা ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় তাহার পরিচয় পাইবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগই আমার ছিল।"

"তাহা ছাড়া শরীর-বিজ্ঞান-বিদ্ হিসাবে আমি বলিতে পারি যে, প্রকৃত প্রজনন-শক্তি ২১ বৎসর বা উহারই কাছাকাছি বয়সের পূর্ব্বে জন্মে না, এবং অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনা অসময়ে উদ্দীপ্ত না হইলে ঐ বয়সের পূর্ব্বে কামেচ্ছাও জাগ্রত হয় না। অকালে যখন ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা জাগ্রত হয় তখন তাহার মূলে থাকে কৃত্রিম প্রয়োজন, এবং অধিকাংশ সময়েই তাহা কুশিক্ষার পরিণাম।"

"সে যাহাই হউক্, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, ইন্দ্রিয় সংযমে যে-বিপদের আশঙ্কা আছে, স্বাভাবিক কাম-প্রবৃত্তিকে সময়ের পূর্ব্বে জাগ্রত করার বিপদ তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী। আমি যাহা বলিতে চাই তাহার অর্থ আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন।"

এরূপ অভিমত আরও অনেক সংগ্রহ করা যায়। এই সব অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত সংগ্রহ করার পর এম-বুরো ১৯০২ সালে 'ব্রুসেল' সহরে স্বাস্থ্য

এবং নীতি সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক সভার অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। সভায় ১০২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারাই উপস্থিত ছিলেন পৃথিবীর ভিতর এই বিষয়ে যাঁহাদের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সিদ্ধান্তটি এইরূপ—"তরুণদিগকে সর্ব্বাগ্রে এই কথাই শিক্ষা দেওয়া দরকার যে, ইন্দ্রিয় সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্য স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর তো নহেই বরং ইহারা সেই গুণগুলিরই অন্যতম—যাহা পালন করা ডাক্তারী এবং স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার দিক হইতেই প্রয়োজন।"

এম-বুরো আরও বলিতেছেন—"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'ক্রিশ্চিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের' মেডিকেল ফ্যাকালটির অধ্যাপকেরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন যে—'যে মত বলে, সংযত জীবন স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা বলিতে পারি যে, সে-মত কোনো যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পবিত্র এবং নৈতিক জীবন যাপন করিয়া কাহারও ক্ষতি হইয়াছে এরূপ প্রমাণ আমরা পাই নাই।'

"সুতরাং এ-সম্বন্ধে চূড়ান্ত রূপেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এম-রায়সেনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদী এবং নীতিবিদ্‌রাও এই একান্ত সহজ এবং শারীরিক সত্যটির উল্লেখ করিতে পারেন যে, 'আহার এবং ব্যায়ামের ন্যায় ইন্দ্রিয় ক্ষুধার পরিতৃপ্তির প্রয়োজন নাই। এ-কথা সত্য যে, দুই একটি অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া নর-নারী কোনও জটিল বিক্ষোভ এবং এমন কি দুঃখদায়ক অসুবিধা ভোগ না করিয়াই সংযত জীবন যাপন করিতে পারে। এ-কথাও বলা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা সাধারণ লোক কখনই

ব্যাধিগ্রস্ত হয় নাই এবং ত্নিয়ায় সাধারণ লোকের সংখ্যাই ঢের বেশী। পক্ষান্তরে অসংযমের দ্বারা অত্যন্ত গুরুতর এবং বহু-জন-বিদিত ব্যাধিসমূহের সৃষ্টি হয়। কথাটি অবশ্য বহুবার বলা হইয়াছে, তথাপি পুনরায় বলা দরকার। কারণ এই ধরণের সহজ-সত্য প্রতিনিয়তই লঙ্ঘিত হইতেছে। প্রকৃতি অত্যন্ত সহজ এবং অভ্রান্ত ভাবেই খাদ্যের ভিতর দিয়া আমরা যে অতিরিক্ত পুষ্টি গ্রহণ করি তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মাসিক ঋতু অথবা অনায়াস-স্খলিত বীর্য্যের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি।'

"সুতরাং প্রকৃত প্রয়োজন এবং অবিকৃত অনুভূতির সহিত এই প্রশ্নের কোনো সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া ডাঃ ভিরি ঠিকই করিয়াছেন।" দেহকে যদি খাদ্য না দেওয়া যায়, অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি যদি বন্ধ করা হয়, তবে তাহার ফল যে কি হয়, সে কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সাময়িক বা সম্পূর্ণ সংযমের ফলে কাহারও দেহে কোনো স্থায়ী বা গুরুতর রোগের চিহ্ন ধরা পড়িয়াছে—এ-কথা কাহাকেও বলিতে শুনা যায় নাই। * * সাধারণ জীবনে আমরা এই দৃষ্টান্তই দেখিতে পাই যে, সংযমী মানুষ চরিত্র-বলে, কাজের উৎসাহে, দেহের শক্তিতে কাহারও অপেক্ষা হীন নহে এবং বিবাহ করিলে পুত্রোৎপাদন শক্তিও তাহাদের কোনো লোক অপেক্ষা কম বলিয়া প্রমাণিত হয় না। * * * যে-প্রয়োজন এত রকমের পরিবর্ত্তন মানিয়া লয় এবং যে-সহজাত অনুভূতি এরূপভাবে তৃপ্তির আজ্ঞাকে স্বীকার করে তাহা প্রয়োজনও নহে, সহজাত অনুভূতিও নহে।"

"বর্দ্ধিষ্ণু বালকের পক্ষে দৈহিক উন্নতির জন্য যৌন-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার আদৌ প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং উন্নতির

জন্য সম্পূর্ণ সংযমই পুরামাত্রায় আবশ্যক। যাহারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহারা স্বাস্থ্যের মহাক্ষতি করে। যৌবন-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মহা পরিবর্ত্তনও সাধিত হয়, নানা ক্ষেত্রে নানা রকমের চাঞ্চল্য দেখা দেয় এবং সাধারণ উন্নতিও হয়। যৌবন সমাগমে বালকের জীবনী-শক্তি সম্পূর্ণ ভাবেই অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার। কারণ এই সময়ে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ব্যাধিকে বাধা দিবার শক্তি মানুষের কমিয়া যায়, ব্যাধি এবং মৃত্যুর হার পূর্ব্বের বয়সের অপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। * * * নানা ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শরীর যে ভাবে বাড়িয়া চলে, তাহার দৈহিক ক্রমবিকাশ এবং সমগ্র শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ যে-সমস্ত অবস্থার শেষে বালক মানুষ হয় তাহা প্রকৃতির বহু শ্রম-সাধ্য চেষ্টার ফল। সেই সময় সব রকম মাত্রা লঙ্ঘনই বিপদজনক, বিশেষ ভাবে অকাল ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।”

দেহ-বিজ্ঞানের দিক হইতে ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এম-বুরো অতঃপর ইহার নৈতিক এবং মানসিক উপযোগিতা সম্পর্কে অধ্যাপক মণ্টেগোজার মন্তব্যের নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ঃ—

"সমস্ত লোকই, বিশেষভাবে যুবকেরা ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপকার সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার ফলে স্মরণশক্তি স্থির ও অবিকৃত হয়, বুদ্ধি প্রখর ও উর্ব্বর হয়, ইচ্ছাশক্তি কর্ম্মপ্রবণ হয়, সমস্ত চরিত্র এরূপ একটি শক্তি লাভ করে যাহা ইন্দ্রিয়-ভোগ-নিরত লোকেরা কল্পনাও করিতে পারে না। সংযম আমাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত বস্তুকেই এমন একটি স্বর্গীয় বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া তোলে যে, তেমন আর কেহই পারে না। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর উপরেই ইহা নূতন আলোকের রেখা পাত করে ; যে আনন্দ ম্লান হইতে জানে না, যাহা চিরন্তন, সেই আনন্দে ইহা আমাদের চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে।" গ্রন্থকার আরও বলেন—"যে-সব তেজস্বী যুবক ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তাহারা যে আনন্দ, যে গভীর সুখ, যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস উপভোগ করে তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের দাস যাহারা তাহাদের শান্তি-হীন আবেশ ও চাঞ্চল্যময় উত্তেজনার কোনোই সাদৃশ্য নাই।" অতঃপর তিনি ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতার সহিত কামুকতা ও স্বেচ্ছাচারের শোচনীয় পরিণামের তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন—"সংযমের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে— এ কথা কাহাকেও বলিতে শোনা যায় না। কিন্তু নৈতিক ব্যভিচারের ফলে

দেহ যে ভীষণ ব্যধি সমূহের দ্বারা আক্রান্ত হয়—এ-কথা কে না জানে? দেহ অতিমাত্রায় অন্তঃসার শূন্য হইয়া উঠে। কিন্তু দেহের অপেক্ষাও বড় অধঃপতন হয় চিন্তা-শক্তির, হৃদয়ের এবং বুদ্ধিবৃত্তির। চরিত্র যে হীন হইয়া পড়িতেছে, যুবকেরা যে অসংযত কাম-তৃষ্ণায় মাতিয়া উঠিতেছে, স্বার্থপরতা যে কূল চাপাইয়া উঠিতেছে—এ-অভিযোগ তো সব দিক হইতে আজ শুনিতে পাওয়া যায়।"

বিবাহের পূর্ব্বে যৌন-ব্যাপারে তথাকথিত স্বেচ্ছাচার এবং তাহার ফলে যুবক-যুবতীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করে তাহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। এইরূপ স্বেচ্ছাচারের যাঁহারা সমর্থন করেন তাঁহারা একথাও বলেন—যৌন-প্রবৃত্তির সম্মুখে বাধা স্থাপনের মানে, 'মানুষ তাহার নিজের দেহ কি ভাবে পরিচালিত করিবে সেই স্বাধীনতার উপরেই হস্তক্ষেপ করা।' গ্রন্থকার নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যৌন-স্বেচ্ছাচারের ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া সমাজনীতি এবং সামাজিক মনোবিজ্ঞানের পরিপুষ্টির জন্যই প্রয়োজন।

গ্রন্থকার বলেন—"সমাজতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতে সামাজিক জীবন নানাবিধ সম্পর্কের সমষ্টি ছাড়া, কাজের ঘাত-প্রতিঘাতের সন্নিবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ ক্ষেত্রে একটি কাজকে অন্য সমস্ত কাজ হইতে পৃথক করিয়া, ভিন্ন করিয়া দেখার কল্পনাও করা যায় না। আমরা যে সঙ্কল্পই করি না কেন, যে কাজই করিতে চেষ্টা করি না কেন, সমষ্টিগত শক্তি সেই সঙ্কল্প এবং চেষ্টাকে আমাদের চারিপার্শ্বের আর সকলের সঙ্কল্প এবং চেষ্টার সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। এমন কি আমাদের গোপনতম চিন্তাও, অকস্মাৎ উদ্ভূত-ইচ্ছাও এত দূরদেশ পর্য্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তার করে যে, সে-দূরত্বের

পরিমাপ করা আমাদের মনের পক্ষেও সম্ভবপর নহে। মানুষের ভিতরে যে সামাজিক গুণ আছে তাহা বাহিরের বা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাপার নহে। তাহা অন্তর্নিহিত গুণ—তাহা মনুষ্যত্বেরই একটা অংশ বিশেষ। মানুষ—মানুষ বলিয়াই সামাজিক জীব। তাহার এমন আর কোনো কর্ম্মক্ষেত্র নাই যাহাকে তাহার এত নিজের বলিয়া মনে করা যায়। দেহ-বিজ্ঞান এবং নীতি-বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং রাজনীতি, মনোরাজ্য এবং রূপ-রাজ্য, ধর্ম্ম এবং সমাজ—সমস্তই একটি রহস্যময় বন্ধনে এবং অবর্ণনীয় সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন নিয়ম চক্রের সহিত জড়িত হইয়া আছে। এ-বন্ধন এত দৃঢ়, ইহার জাল এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, সমাজতত্ত্ববিদেরা সময়ে সময়ে সত্য সত্যই মহা বিপদে পতিত হ'ন। সর্ব্বকাল এবং সর্ব্বসময়ের ভিতর দিয়া ইহা যে বিরাটের অভিব্যক্তি প্রকট করে তাহাই তাঁহাদিগকে সত্যকার বিপদের ভিতরে নিক্ষেপ করে। একবার মাত্র দৃষ্টিপাতের দ্বারাই তাঁহারা বুঝিতে পারেন, কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির দায়িত্ব কি বিপুল এবং কোনো কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান যে-স্বাধীনতার দ্বারা ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে তাহা তাহাকে কত ক্ষুদ্র করিয়া তোলে!"

গ্রন্থকার আরও বলেন—"যদি এ-কথা আমরা বলিতে পারি যে, কোনো বিশেষ অবস্থায় রাস্তায় থু থু ফেলিবার অধিকারও আমার নাই, তবে এ-দাবীই বা কেমন করিয়া করা যায় যে, আমার যৌন-প্রবৃত্তিকে আমি যেমন খুশী তেমনি ভাবে পরিচালিত করিব? কোনো বিশেষ অধিকারের বলে এই প্রবৃত্তি কি সংহতি-শক্তির যে সার্ব্বজনীন নিয়ম আছে তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে? পক্ষান্তরে ইহাই দেখা যায় যে, ইহার এত বড় একটা গুরুত্ব আছে যে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির কাজের ভিতর দিয়া

সমাজকে ধাক্কা দেয়। যে যুবক এবং বালিকা পরস্পরের ভিতর অবৈধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। তাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের এই মিলন কেবল তাহাদের নিজেদেরই ব্যাপার—ইহার সঙ্গে অন্য কাহারও কোনো সম্পর্ক নাই। নিজেদের স্বাধীনতার গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া তাহারা মনে করে যে, তাহাদের এই ঘনিষ্ঠ এবং গোপন সংযোগের দ্বারা সমাজের কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না এবং ইহা সমাজের শাসনেরও অন্তর্ভূক্ত নহে। এ-ভ্রান্তি বালকোচিত ভ্রান্তি। যে সামাজিক সংহতি এক জাতির সকল লোককে একসঙ্গে যোগ-যুক্ত করে, এবং যাহা জাতি বিশেষের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানব জাতিকে একসঙ্গে মিলায়, তাহার পক্ষে কোনো প্রাচীর ভেদ করাই কঠিন ব্যাপার নহে। এমন কি তাহা গোপন কক্ষ সমূহও ভেদ করে। সুতরাং এই সব গোপন মিলনের দ্বারা যে পারস্পারিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তাহা সামাজিক জীবনের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত নানা বিক্ষোভের তরঙ্গ তোলে এবং তাহার শৃঙ্খলাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। মানুষ ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, যাহারা ক্ষণিক এবং নিষ্ফল যৌন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অধিকারের দাবী করে; যে প্রজনন-শক্তি মানুষের ভিতর আছে কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য যাহারা তাহা ব্যবহারের স্বাধীনতার দাবী করে তাহারা সমাজের ভিতর ভেদ এবং বৈষম্যের বীজ ছড়াইয়া দেয়। আমাদের স্বার্থপরতা এবং বিদ্রোহের দ্বারা আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যতই বিকৃত হোক্ না কেন, তাহারা এখনও আশা করে যে, ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা পরিতৃপ্তির যে সব চিরন্তন বিধি-বিধান আছে মানুষ স্বেচ্ছায় আনন্দের সহিত তাহা প্রতিপালন করিবে। এই সর্ত্ত গ্রহণের উপরেই সমাজের শ্রম এবং অর্থ,

মজুরী এবং সম্পত্তির অধিকার, রাজস্ব-বিধি এবং সৈনিকের বৃত্তি, ভোটের অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা—তাহার অসংখ্য বিধি-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। কোনও ব্যক্তি যখন ইহাতে তাহার অংশ গ্রহণে অস্বীকার করে, সে তাহার সেই অস্বীকৃতির দ্বারা এক আঘাতে সমস্ত শৃঙ্খলাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, সমাজ-বন্ধনের প্রত্যেক মূলতত্ত্বকে লঙ্ঘন করে এবং এইরূপে অপরের ঘাড়ের বোঝা ভারি করিয়া তুলে। সমাজ-দেহে সে পরগাছার মত। লুণ্ঠনকারী, চোর এবং জুয়াচোরের অপেক্ষা কোনো অংশেই সে শ্রেষ্ঠ নহে। অন্যান্য শক্তির ন্যায় সমাজের কাছে আমাদের শারীরিক শক্তির জন্যও আমরা দায়ী। এ-কথাও বলা যায় যে, যেহেতু সমাজের হাতে অস্ত্র নাই, এবং বাহির হইতে চাপ দেওয়ার শক্তিও তাহার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই হেতু আমাদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করা ছাড়া সমাজের আর কোনো গত্যন্তর নাই। আর সেই জন্য বিশেষ বিচারপূর্ব্বক এবং সমাজের নিশ্চিত কল্যাণের জন্যই শক্তিটি ব্যাবহার করার দায়িত্ব আমাদের আর সমস্ত দায়িত্ব অপেক্ষা এত বেশী।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও গ্রন্থকারের যুক্তি সমান জোরালো। "একটি প্রাচীন কথা আছে যে, বাহিরের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা সুখের, কিন্তু আদতে ইহা একটা বোঝা স্বরূপ। কথাটির ভিতর অনেকখানি সত্য আছে। স্বাধীনতা মানুষকে বাধ্য করে, তাহার পায়ে বাঁধন আঁটিয়া দেয়। যে-উদ্যম সকলকেই করিতে হয় ইহা তাহারই পরিমাণ বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তি স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে, আত্ম-কর্ত্তৃত্বের প্রসারের ভিতর দিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিবার ইচ্ছাতেই তাহার চিত্ত উদগ্রীব হইয়া থাকে। কর্ম্ম-পদ্ধতি অবশ্য খুবই সহজ। কিন্তু প্রথম অভিজ্ঞতায়

দুঃখদায়ক জটিলতাই মূর্ত্ত হইয়া উঠে। আমাদের স্বভাবে এবং নৈতিক চরিত্রে ঐক্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ইহার কোনো মূল্যই নাই। আমরা আমাদের ভিতরে নানা রকমের এবং পরস্পর-বিরোধী ভাব সমূহের প্রভাব অনুভব করি। তাহাদের প্রত্যেকটির ভিতরেই আমরা নিজেদের সাড়া পাই এবং তথাপি প্রত্যেক ব্যাপার হইতে ইহাই ধরা পড়ে যে, ইহাদের ভিতর হইতেই আমাদিগকে বাছাই করিয়া লইতে হইবে। হে তরুণের দল, তোমরা তো এই কথাই বল যে, তোমাদের নিজেদের জীবন নিজেদের ভাবেই তোমরা যাপন করিতে চাও, তোমরা তোমাদিগকে জানিতে চাও—বুঝিতে চাও। কিন্তু মহাপণ্ডিত ফোরেষ্টারের সহিত আমরা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—তোমাদের কোন্ অংশটাকে তোমরা জানিতে চাও? কোন্‌টা তোমাদের শ্রেষ্ঠতর অংশ—যে অংশ তোমাদের মানসিক শক্তির মাঝখানে অবস্থান করে তাহাই, না যাহা তোমাদের প্রকৃতির নিম্নতম অংশ অধিকার করিয়া আছে, যাহা ইন্দ্রিয় ভোগের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ? এ-কথা যদি সত্য হয় যে, ব্যক্তি এবং সমাজের উন্নতি, আধ্যাত্মিকতার প্রসার এবং বস্তুর উপর আত্মার সম্পূর্ণ জয়ের দ্বারাই সূচিত হয়, তবে আমরা কি বাছিয়া লইব সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু বাছাই ঠিক হইলেও ভিতরে সে-শক্তিও থাকা চাই যাহা কার্য্যে অনুপ্রাণিত করে এবং সে-সাধনাও সহজ নহে। হয় তো তোমরা উত্তর দিবে যে,—আমি বাছাই করিতেই চাই না, আমি নিজেকে সমগ্র ভাবে, সু-সম্বন্ধ ভাবে অনুভব করিতে চাই। বেশ ভালো কথা। কিন্তু জানিয়া রাখিও—এই যে সঙ্কল্প—ইহাও বাছাই করারই নামান্তর মাত্র। কারণ মিলনকে বিরোধের মূল্যেই কেনা যায়।

গেটে বলিয়াছেন—'মৃত্যুর ভিতর দিয়াই জন্ম আসে।' একথা অবশ্য ১৯শত বৎসর আগে খৃষ্ট যাহা বলিয়াছেন তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি বলিয়াছিলেন—'আমি তোমাদিগকে বলিতেছি শোনো, মাটিতে গম পড়িয়া যদি না মরে, তবে তাহাকে একাই থাকিতে হয়, কিন্তু মারা গেলেই তাহা হইতে প্রচুর শস্য উদ্ভূত হয়।'

"এম গ্যাব্রিয়েল সিলেস বলিয়াছেন—'একথা বলা সহজ যে, আমরা মানুষ হইতে চাই, কিন্তু মানুষ হইতে হইলে কর্ত্তব্য—কঠোর কর্ত্তব্য পালন করা দরকার। এমন লোক খুব কমই আছে যে ইহাতে অল্পাধিক পরিমাণে ব্যর্থ না হয়। আমরা স্বাধীন হইতে চাই, এবং একথাটা প্রচার করিবার সময় চেহারাটাকেও অত্যন্ত ভয়াবহ করিয়া তুলি। দাসত্বের স্বাভাবিক অনুপ্রেরণায় যথেচ্ছ ভাবে কাজ করাকে যদি আমরা স্বাধীনতা বলি, তবে সে জন্য আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যদি আমরা সত্যকার স্বাধীনতা পাইতে চাই, তবে আমাদের কোমর বাঁধিয়া অনির্ব্বাণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা ঐক্যের কথা বলি, ব্যক্তিত্বের কথা বলি, স্বাধীনতার কথা বলি, এবং সর্ব্বশেষে স্পর্দ্ধা-ভরে এ-কথাও বলি যে, 'আমরা ভগবানের অমর পুত্র।' কিন্তু হায়, যদি আমরা এই অহংটাকেই ধরিতে চেষ্টা করি, তবে সে আমাদের হাত ফস্কাইয়া পলায়ন করে, সে তখন সামঞ্জস্যহীন এমন অসংখ্য জিনিষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে যাহা একে অপরকে স্বীকার করে না। সে তখন পরস্পর বিরোধী ইচ্ছায় বহুধা হইয়া যায়, অথচ এই সব ইচ্ছার সংযোগেই তাহার সৃষ্টি। বস্তুতঃ আমাদের এই অহং আমরা যে-সব কুসংস্কার, যে-সব প্রলোভনের দাস তাহারই মূর্ত্ত প্রতীক। যে-স্বাধীনতার

সে ভান করে তাহা দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। এই দাসত্বকে সে অনুভব করিতে পারে না—তাই তাহাকে সে বাধাও দেয় না।'

"রায়সেন বলেন—'সংযম একটা ধর্ম্ম যাহা আগাগোড়া শান্তিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু অসংযম এমন সব অতিথিকেই দ্বার খুলিয়া দেয় যাহারা ভীষণ শত্রুতে পরিণত হইতে পারে। প্রবৃত্তির উন্মাদনা যে কোনো বয়সের পক্ষেই বিপজ্জনক, কিন্তু যৌবনে তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধঃপতনের সূচনা করিতে পারে। এ-কথাও বলা যায় যে, ইচ্ছা এবং জ্ঞানের ভিতর ইহা এমন বিপ্লব আনিয়া দিতে পারে, জীবনে যাহার সংশোধন অসম্ভব। বালক জীবনে যখন প্রথম কোনো নারীর সাহচর্য্যে আসে—তখনই সে তাহার শারীরিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক জীবন লইয়া খেলা করিতে বসে। অবশ্য সে এ-কথাটা ধরিতে পারে না। সে বুঝিতে পারে না যে, ইন্দ্রিয়ের উন্মাদনা পরে তাহাকে কি ভীষণ ভাবে অনুসরণ করিবে, যাহাকে প্রভুত্ব বলিয়া মনে করা যায় তাহাই তাহাকে কি কঠোর দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করিবে! আমরা একাধিক জীবনের কথা জানি যাহা উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, অথচ যাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ইহাও জানি যে, প্রথম নৈতিক পতনের দিনেই তাহাদের অধঃপতনের গোড়া-পত্তন হয়।'

"নিম্নোদ্ধৃত বিখ্যাত কবিতাটিতে দার্শনিকের এই মতবাদেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়ঃ—

'মানুষের ঐ শুদ্ধ আত্মা পাত্রটি সুগভীর—
দাগ যদি পড়ে অঙ্গে তাহার কোনোরূপে একবার,
তার পরে কর তাহার উপরে উজার সিন্ধুনীর,
যতবার ধোও—যেমনি করিয়া সে গ্লানি ঘোচে না তার।'

"গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দেহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিখ্যাত দেহ-তত্ত্ববিদ্ জন-জি-এম-ফ্রেডারিক যাহা বলিয়াছেন তাহাও এই মতবাদেরই সমর্থন করে। তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

'উন্মেষোন্মুখ রিপুর পরিতৃপ্তি কেবল যে নৈতিক অপরাধ তাহাই নহে, তাহা দেহেরও ভয়ানক অপকার করে। এই যে নব-জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা—একবার যদি ইহার কাছে মাথা নোয়ানো যায়, তবে তাহার অত্যাচারের আর সীমা-শেষ থাকে না। ইহা এরূপ একটা অপরাধ যে, মানুষ সন্তুষ্ট চিত্তে ইহার আদেশ পালন করে এবং এইরূপে ইহাকে দুর্দ্দমনীয় করিয়া তোলে। প্রত্যেকটি নূতন কাজের দ্বারা অভ্যাসের শৃঙ্খলে নূতন কড়া সংযুক্ত হয়।

'অনেকের এরূপও হয় যে, ইহার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার শক্তিই তাহাদের থাকে না, তাহাদের চরম পরিণাম হয় দৈহিক এবং মানসিক অধঃপতন, তাহারা অভ্যাসের দাস হইয়া পড়ে—যে অভ্যাস মানসিক বিকার নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজ্ঞানতার ফল। এই অবস্থার হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইতেছে চিন্তার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলা, সমস্ত জীবনকে একটা শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া পরিচালিত করিতে শেখা।"

উপরোক্ত মতবাদের সঙ্গে এম-বুরো ডাঃ এস-কাণ্ডির নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

"যৌন-সম্ভোগের ইচ্ছা সম্পর্কে এ-কথা বলা যায় যে, বুদ্ধি এবং ইচ্ছার দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে রাখা যায়। কথাটা যৌন-সম্ভোগের 'প্রয়োজন' না বলিয়া যৌন-ভোগের 'ইচ্ছা' বলাই সঙ্গত। কারণ ইহা এরূপ ব্যাপার নহে যে, ইহা না করিলে জীবন ধারণই অসম্ভব। বস্তুতঃ

ইহা একেবারেই প্রয়োজনীয় বস্তু নহে। কিন্তু অনেক লোকেরই বিশ্বাস যে, ইহা সত্য সত্যই প্রয়োজনীয় বস্তু। এই ইচ্ছাটাকে তাহারা যেরূপ ভাবে প্রতিভাত করে তাহাতেই মনে হয় যে, যৌন-সম্ভোগ অপরিহার্য্য প্রয়োজন। যৌন-সম্ভোগের কাজ যে প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিহার্য্য পরিণাম—এ-সত্য আমাদের কাছে ধরা পড়ে নাই। বরং আমাদের কাছে ইহার বিপরীতই মনে হইয়াছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়া স্বেচ্ছায় প্রস্তুত হইয়া আমরা ইন্দ্রিয় সেবায় নিরত হই।”

বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা উচিত, সংযম রক্ষা করা অসম্ভব নহে বরং অতিমাত্রায় সম্ভব, তাহা অপকারী নহে বরং দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই বিশেষ উপকারী—এই কথাগুলি অজস্র প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়া দিয়া এম-বুরো অবিচ্ছিন্ন সংযমের মূল্য এবং সম্ভাবনার সম্পর্কে একটি অধ্যায় ব্যয় করিয়াছেন। ইহার গোড়াকার অংশটি উদ্ধৃত করার উপযুক্ত ঃ—

"যৌন-সম্ভোগ ব্যাপারে যাঁহারা প্রকৃত মুক্তির বাণী প্রচার করেন, সেই সব বীরদের ভিতর সর্ব্বাগ্রে সেই সব যুবক-যুবতীদেরই নাম করা দরকার, যাঁহারা বড় কোনো কাজে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য চির-জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের পথ গ্রহণ করিয়াছেন—বিবাহিত জীবনের আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প গ্রহণের কারণ অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন। কেহ অক্ষম পিতামাতার সঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, কেহ বা পিতৃ-মাতৃহীন ভাই-ভগ্নীদের কাছে পিতা-মাতার আসন অধিকার করিয়া থাকিতে চা'ন, কেহ বা আপনাকে উৎসর্গ করিতে চা'ন বিজ্ঞানের বা শিল্পের সাধনায়, অথবা দীন-দরিদ্র বা ব্যাধি-পীড়িতের সেবায়, অথবা নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের কাজে বা ধর্ম্মোপাসনায়। এইরূপে এই স্বেচ্ছাবৃত ত্যাগের মূল্য কোথাও বা বেশী কোথাও বা কম। কেহ কেহ সুশিক্ষা এবং শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নৈতিক অভ্যাসগুলি প্রতিপালনের ফলে যৌন-প্রলোভনের চাপই অনুভব করেন না, আবার কেহ কেহ বা এরূপও আছেন, ধর্ম্মপথে ঢের দূর অগ্রসর

হইলেও যাঁহাদের মনের পশুকে—রক্ত-মাংসের দাবীকে জয় করিতে ঢের যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। আর এ-যুদ্ধ যে কি ভীষণ তাহা যাহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে সেই জানে। কিন্তু সে যাহাই হোক্, অন্তিম সঙ্কল্প সকলেরই এক। এইসব নর-নারী ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাদের কল্যাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে পথ বাহির করিয়াছেন সে পথ বিবাহ না করা। হয় নিজেদের কাছে, না হয় ভগবানের কাছে তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ সংযমের সহিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। বিবাহের কর্ত্তব্য যতই সুনির্দ্দিষ্ট—যতই নিশ্চিত হোক্ না কেন, এ সমস্ত সঙ্কল্পও অবৈধ নহে। কারণ উদার-অনুপ্রেরণা ও মহৎ-উদ্দেশ্য হইতেই তাহাদের সৃষ্টি। মাইকেল এঞ্জেলোকে যখন বিবাহের কথা বলা হইয়াছিল—তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—'চিত্র-শিল্পের দেবতা অত্যন্ত প্রেম-সংশয়ী। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করিতে পারেন না।' তাঁহারই মতো কত জন এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন!"

এম-বুরো প্রায় সমস্ত রকমের লোকেরই বিবরণ দিয়াছেন যাঁহারা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছেন। এই সব ইউরোপীয় বন্ধুদের অভিজ্ঞতা হইতে পূর্ব্বোক্ত উক্তি প্রমাণ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। কেবল ভারতবর্ষেই বাল্য-বিবাহের কথা শোনা যায়। ছেলে-মেয়েকে ভালো ঘরে বিবাহিত হইতে দেখা এবং তাহাদিগের সমৃদ্ধি বাড়ানো ছাড়া পিতামাতার এখানে আর কোনো চিন্তা, আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। এই দুইটি জিনিষের একটি দ্বারা দেহ ও মন অকালে ধ্বংশ হয়, আর একটি আলস্যের রসদ যোগায় এবং মানুষকে অনেক সময় পরগাছার মতো করিয়া ফেলে। আমরা সংযম এবং স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণের দুঃখকে অযথা অতিরঞ্জিত করিয়া দেখি, তাহাদের উপর অসাধারণত্বের আরোপ করি এবং ভাবি উহা মহাত্মা ও

যোগীদের ব্যাপার। সুতরাং সাধারণ জীবন হইতেও উহা নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হয়। এ-কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, সমাজের সাধারণ অবস্থা যেখানে আস্তাকুড়ে পরিণত হয়, যোগী এবং মহাত্মার উদ্ভব সেখানে কল্পনাও করা যায় না। যাহা অন্যায় তাহা খরগোসের মতো দ্রুত গতিতে চলে, কিন্তু যাহা ভালো তাহার গতি কচ্ছপের মতো মন্দ। এই যুক্তি অনুসারে পশ্চিমের ভোগ-বিলাস-পরায়ণতা বিদ্যুতের গতিতে আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে এবং বিভিন্ন ধরণের উপকরণের দ্বারা আমাদের চোখ ঝল্সাইয়া দিতেছে। তাই জীবনের সত্যকে আমরা ধরিতে পারিতেছি না। প্রতি মুহূর্ত্তে তারের মারফৎ পশ্চিমের যে জাঁক-জমক আমাদের মাঝে ছড়াইয়া পড়িতেছে, দিনের পর দিন তাহার জাহাজ বোঝাই যে-পণ্যসম্ভার আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিতেছে তাহারই ফলে আমরা আমাদের সংযমের জন্য আজ লজ্জা বোধ করি, স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যকে অপরাধ বলিয়া মনে করি। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা যাহা দেখি তাহাই পশ্চিমের সমস্তটা নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দিগকে দেখিয়া সেখানকার শ্বেতাঙ্গেরা যেমন তাহাই আমাদের সমগ্র রূপ মনে করিয়া ভুল করেন, তেমনি পশ্চিমের যে-সব লোক এবং যে-সব পণ্য এ দেশে আসে তাহাই দেখিয়া যদি আমরা পশ্চিমের বিচার করি, তবে পশ্চিমের সম্বন্ধে আমরাও ভুল করিব। পশ্চিমেরও পবিত্রতা ও শক্তির একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অফুরন্ত উৎস আছে। উপরের মোহের পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরের জিনিষ দেখিবার মতো দৃষ্টি যাহার চোখে আছে, এই উৎসের সন্ধান তাহারই চোখে ধরা পড়িবে। ইউরোপের বিরাট মরুভূমির ভিতর মরুদ্যানও আছে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে এই মরুদ্যানের ভিতর হইতে সে যত খুশী পবিত্রতম জীবন-সুধাও পান করিতে

পারে। সংযম এবং দারিদ্র্য একান্ত অনাড়ম্বরে, একান্ত বিনয়ের সঙ্গে শত শত নর-নারী সেখানে গ্রহণ করিতেছেন—অন্য কোনো কারণে নহে, কেবল প্রিয়জনকে অথবা দেশকে সেবা করিবার জন্য। আমরা হামেসাই বলি যে, আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সহিত আধ্যাত্মিকতার কোনো যোগ নাই, উহা তাহাদেরই জন্য যে সব সাধু-সন্ন্যাসী হিমালয়ের অরণ্যে অথবা তাহারই কোনও দুরধিগম্য গহ্বরে বাস করে। যে আধ্যাত্মিকতার প্রাত্যহিক জীবনের সহিত যোগ নাই, দৈনন্দিন জীবনের উপর যে আধ্যাত্মিকতা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহা তো মিথ্যা বস্তু। যুবক-যুবতীদের জন্যই সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' লেখা হয়। এই সব যুবক যুবতী জানিয়া রাখুন যে, যদি তাঁহারা চারিপাশের আবহাওয়া পবিত্র করিতে চা'ন, যদি তাঁহারা দুর্ব্বলতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে চা'ন, তবে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই পালন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইহাও জানিয়া রাখুন, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যত কঠিন কাজ বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা তত কঠিন কাজও নহে।

এম-বুরো আরও কি বলেন—এইবার তাহাও শোনা যাক্।—"যে পরিমাণে বর্ত্তমান সমাজ-বিজ্ঞান আমাদের রীতি-নীতির ক্রমবিকাশকে অনুসরণ করিয়া চলিবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সামাজিক সত্যের মূল তত্ত্বগুলি আমরা যত গভীর ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিব, আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ন্ত্রণে নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্যের মূল্য ততই আমরা ভালো করিয়া অনুভব করিতে পারিব।" "বৃহত্তর মানব সমাজের পক্ষে বিবাহ জীবনের সাধারণ অবস্থা হইলেও, সমস্ত লোকই কিন্তু বিবাহ করিতে পারে না—করা উচিতও নহে। একটু আগেই যে-সব বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ কর

হইয়াছে তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অন্ততঃ আরও তিন রকমের ব্রহ্মচারী আছেন, বিবাহ না করার জন্য যাঁহাদিগকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না :—(১) যে সব যুবক-যুবতী ব্যবসার দিক দিয়া বিচার করিয়া অথবা অর্থ-নৈতিক কারণে নিজেদের বিবাহের সময় পিছাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, (২) যাঁহারা উপযুক্ত জীবন সঙ্গী পাওয়া যায় না বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণে বাধ্য হ'ন, (৩) বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইতে পারে এমন কোনো রোগ থাকার জন্য যাহাদের বিবাহ না করাই উচিত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহের ইচ্ছা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করাই যাহাদের পক্ষে সঙ্গত। শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রাচুর্য্য এবং আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা চির জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্পে দৃঢ় হইয়া আছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, এই সব লোকের পক্ষে—নিজেরই সুখের জন্য অথবা সমাজের কল্যাণের জন্য যাহাদের বিবাহ না করাই সঙ্গত, তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন ঢের সহজ হইয়া পড়ে। এই ত্যাগ তাহাদিগকে দুঃখ তো কম দেয়ই, তাহাদের আনন্দও বৃদ্ধি করে। যাঁহারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালনে ব্রতী হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা নিজেদের সর্ব্বস্ব ভগবানকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, প্রার্থনা এবং আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মচর্য্য জীবনের একটা অসম্পূর্ণ অবস্থা তো নহেই বরং ঠিক তাহার বিপরীত। ইহা সেই শ্রেষ্ঠতর পরিস্থিতি যাহাতে পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়া মানুষের প্রবৃত্তির উপরে তাহার ইচ্ছাশক্তি জয় লাভ করে।"

"যে-সব বালক-বালিকার বিবাহের বয়স হয় নাই, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের দৃষ্টান্তে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, যৌবন ব্রহ্মচর্য্যে ব্যয় করা

অসম্ভব নহে। আর যাহারা বিবাহিত, এই দৃষ্টান্তে দাম্পত্য-জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত সংযম রক্ষা সম্বন্ধে তাহাদের মনও সচেতন হইয়া উঠিবে এবং যতই ন্যায়-সঙ্গত হোক্ না কেন, নৈতিক মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠতর দাবীকে উপেক্ষা করিয়া স্বার্থ-চিন্তাকে তাহারা কখনো অন্তরে স্থান দিবে না।"

ফোর্ষ্টার বলেন—"স্বেচ্ছাবৃত ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা বিবাহের মূল্য কমে না বরং ইহার দ্বারা দাম্পত্য-বন্ধনের পবিত্রতা সুরক্ষিত হয়। কারণ প্রকৃতির জবরদস্তির বিরুদ্ধে মানুষের স্বাধীনতার জয়ের একটা সুস্পষ্ট স্বরূপই ইহার দ্বারা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মানুষের আকস্মিক খেয়াল এবং ইন্দ্রিয় তাড়নায় ব্রহ্মচর্য্য বিবেকের ন্যায় কাজ করে। এক হিসাবে ব্রহ্মচর্য্যকে বিবাহের রক্ষা-কবচও বলা যায়। কারণ ইহার প্রভাবে দম্পতি বুঝিতে পারে যে, যেখানে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, সেখানে তাহারা কেবল অন্ধ প্রকৃতির দাস মাত্র নহে, এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাহারা এমন একটা স্থান গ্রহণ করিতে পারে যেখান হইতে স্বাধীন মানুষের মতো প্রভুত্ব করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। যাহারা নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্যকে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া উপহাস করে, তাহারা জানে না প্রকৃত পক্ষে কি করিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারে না যে, যে-চিন্তাধারা তাহাদের দ্বারা এই সব কথা বলায়, যুক্তিকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিলে তাহাতে বেশ্যাবৃত্তি এবং বহু-বিবাহকে সমর্থন করিতে হয়। প্রকৃতির দাবী যদি অপ্রতিহত হয়, তবে বিবাহিত লোকদের ভিতর পবিত্র জীবন যাপন করাই বা কিরূপে সম্ভব? সর্ব্বশেষে, তাহারা একথাও ভুলিয়া যায় যে, বহু-বিবাহিত জীবনে দম্পতির ভিতর একজন যখন ব্যাধি বা অন্য কারণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন অন্যজন

কয়েক মাসের জন্য অথবা কয়েক বৎসরের জন্য অথবা চিরজীবনের জন্যই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বাধ্য হয়। কেবল এই একটি মাত্র কারণেই ব্রহ্মচর্য্যের সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা যেরূপ হইবে তাহারই অনুপাতে এক-পত্নিত্বের আদর্শও ছোট ও বড় হইবে।

৭

আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনের সম্বন্ধে একটি অধ্যায় লেখার পর এম-বুরো আর একটি অধ্যায়ে বিবাহের কর্ত্তব্য এবং তাহা যে অচ্ছেদ্য—সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন যে, অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যদিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, তবু জনসাধারণের পক্ষে এই পথ অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। আর সেই জন্যই বিবাহকে তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করা দরকার। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, যদি বিবাহের দায়িত্ব এবং বিধি-নিষেধগুলি যথাযথ ভাবে পালন করা যায়, তবে জন্ম-নিরোধের কৃত্রিম ব্যবস্থাগুলির জন্য ওকালতী করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। নৈতিক ব্যাপারে ভুল-শিক্ষা বর্ত্তমান নৈতিক-স্বেচ্ছাচারের সৃষ্টি করিয়াছে। যে সমস্ত 'উন্নতিশীল' লেখক বিবাহ প্রথাকে উপহাস করিয়াছেন—তাঁহাদের মতবাদের আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"এই সব ভ্রান্ত নীতিবিদ্ এবং লেখকেরা, সাধারণতঃ দেখা যায়, সম্পূর্ণ নীতি-জ্ঞান-বর্জ্জিত এবং তাঁহাদের ভিতর প্রকৃত সাহিত্যিক অনুভূতিও অনেক সময় পাওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে ইহা শুভই বলিতে হইবে যে, তাঁহাদের মত বর্ত্তমান সমাজের মনস্তত্ত্ববিদ্ এবং সমাজতত্ত্ববিদের মতের মোটেই অনুকূল নহে: তাহা ছাড়া হৈ-চৈ ও হল্লায় ভরা নভেল, নাটক ও সংবাদপত্রের রাজ্যের সহিত, যেখানে চিন্তার অনুশীলন করা হয়, মানসিক এবং সামাজিক জীবনের রহস্যময় ব্যাপারগুলি লইয়া গভীরভাবে

আলোচনা করা হয়, সেই রাজ্যের প্রভেদও বিস্তর। বস্তুতঃ এখানে গরমিল এত বেশী যে, সেরূপ বিরোধ আর কোনো ব্যাপারেই দেখা যায় না।"

এম-বুরো বিবাহ-বন্ধনহীন স্বাধীন প্রেমের যুক্তিকে স্বীকার করেন না। "'বিবাহ নর-নারীর ভিতর মিলনের যোগ-সূত্র, এ-মিলন সমস্ত জীবনের জন্য, ইহাতে স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্য আসিয়া যুক্ত হয়'—ইহাই মোডেষ্টিনের মত এবং এই মতের সহিত এম-বুরোর মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। বিবাহ কেবল মাত্র 'আইনের চুক্তি' নহে—তাহা ধর্ম্ম-সংস্কার, তাহার নৈতিক দায়িত্ব আছে। ইহা বনের বানরকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। "বিধিমত বিবাহিত হইলেই মানুষ যাহা খুশী করিতে পারে—এরূপ মনে করাও অত্যন্ত ভুল। এমন কি, স্বামী-স্ত্রী যেখানে সন্তানোৎপাদনের নৈতিক নিয়ম পালন করেন সেখানেও এ-কথা মনে করা অন্যায় যে, তাঁহাদের আনন্দের জন্য ইন্দ্রিয় সম্ভোগের যে কোনো পদ্ধতি তাঁহারা অবলম্বন করিতে পারেন। এই নিষেধ ব্যক্তিগত ভাবে যেমন তাঁহাদের পক্ষে উপকারী, তেমনি সমাজের পক্ষেও উপকারী। বিবাহ সমাজের পালন ও উন্নতির সোপান হওয়াই সঙ্গত। গ্রন্থকার বলেন যে—"বিবাহের দ্বারা যৌন-সম্ভোগ প্রবৃত্তির উপর যে কঠোর সংযমের শৃঙ্খল আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা ছিন্ন করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এই সুযোগ প্রকৃত ভালবাসার পথে সর্ব্বদা ভয়ের কারণ স্বরূপ হইয়া আছে। এই বিপদ সাবধানতার দ্বারাই অতিক্রম করা যায়। সাবধান থাকিতে হইবে যে, আমাদের যৌন-সম্ভোগের ক্ষুধা যেন বিবাহের উদ্দেশ্যের গণ্ডীকে কখনো লঙ্ঘন না করে।" সালেসের সেণ্ট ফ্রান্সিস্ বলেন—"তীব্র ঔষধ সেবন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ, কেহ যদি

মাত্রার বেশী পান করে, অথবা ঔষধ যদি ঠিক ভাবে প্রস্তুত না হয় তবে সে ঔষধের দ্বারা ভয়ানক ক্ষতি হয়। বিবাহ পবিত্র জিনিষ এবং আংশিক ভাবে তাহা কামুকতারও প্রতিষেধক। ইহা যে খুব ভালো দাওয়াই তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও খুব কড়া দাওয়াই। সুতরাং সাবধানে ব্যবহার না করিলে গুরুতর বিপদের আশঙ্কাও আছে।"

অতঃপর গ্রন্থকার সেই মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন, যে মতবাদ বলে—খেয়াল মতো বিবাহ করা অথবা বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করার সকলেরই স্বাধীনতা আছে এবং সকলেই কোনো রকমের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়াই যথেচ্ছ ভাবে ইন্দ্রিয় সম্ভোগ করিতে পারে। এক-বিবাহ প্রথার উপর জোর দিয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"ইচ্ছামত বিবাহ করিবার বা স্বার্থের খাতিরে অবিবাহিত থাকিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে—এ-কথা মনে করা ভুল। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় ভুল হইতেছে এই কথা মনে করা যে, বিধিমতে বিবাহিত দম্পতি ইচ্ছা করিলেই একত্র থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা না করিলেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন। তাঁহারা পরস্পরকে যখন মনোনয়ন করেন কেবল তখনই তাঁহাদের স্বাধীনতা আছে। অত্যন্ত ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া কেবল তাহাকেই মনোনয়ন করিতে হইবে, যাহাকে লইয়া যে নবজীবনে প্রবেশ করার উদ্যোগ করা হইতেছে তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেমনই বিবাহ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রভাব নানাদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে; যাহারা তাহার অভাবনীয় পরিণাম সৃষ্টি করিয়াছে কেবল সেই দুইটি প্রাণীর ভিতরেই

তাহা আর নিবদ্ধ থাকে না। বর্ত্তমান সময়ের উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য এই সব পরিণাম দম্পতির দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে গৃহের ভিত্তি দুলিয়া উঠে, যে-মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয় ক্ষুধার খেয়াল এক-নিষ্ঠ মিলনের হিতকর নিয়মতন্ত্রতার স্থান গ্রহণ করে, তখনই ইহার গুরুত্ব, সমাজ-দেহে যে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহার ভিতর দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বহু দূর-বিস্তৃত এই বিক্ষোভের এবং ইহার জটিল সম্বন্ধগুলি সম্পর্কে যাঁহারা সচেতন, তাঁহারা জানেন যে, মানুষের সৃষ্ট সমস্ত প্রথাই ক্রম-বিকাশের চিরন্তন নিয়মকেই অনুসরণ করিয়া চলে। সুতরাং তাঁহারা ইহাও জানেন যে, অন্যান্য সমস্ত প্রথার মতই বিবাহও আবশ্যক পরিবর্ত্তন অবশ্য গ্রহণ করিবে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহারা বিশেষ চিন্তাও করেন না। কারণ এ-দিক দিয়া যে উন্নতি হইবে তাহার দ্বারা বিবাহের বন্ধনই যে দৃঢ় হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পরস্পরের অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহচ্ছেদের প্রার্থনার নজির দেখাইয়া আজকাল বিবাহ-বন্ধন যে অচ্ছেদ্য এই নিয়মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার দ্বারা যে-নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় তাহার সামাজিক মূল্যটাই উজ্জ্বল করিয়া দেখানো হইয়া থাকে। সমাজের পক্ষে এই নিয়মের মূল্য জানা ছিল না বলিয়া কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উহা কেবল ধর্ম্মের একটি অনুশাসন বলিয়াই মনে করা হইয়াছে, কিন্তু যতই দিন যাইতেছে ততই ধরা পড়িতেছে যে, এই নীতি কেবল মাত্র ব্যক্তির পক্ষেই কল্যাণকর নহে, বৃহত্তর সমাজের পক্ষেও কল্যাণকর।

"বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য—এই নিয়ম খাম-খেয়ালী কোনো ব্যাপার নহে। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে মানুষের সামাজিক জীবনের

সূক্ষ্মতম অংশগুলির সহিত ইহা সংযুক্ত। যেহেতু মানুষ ক্রম-বিকাশের কথা বলে, সেই জন্যই তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এই সর্ব্বজন-অভিপ্সীত অপ্রতিহত উন্নতি কোন্ সব অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ফোরেষ্টার বলেন—'দায়িত্বজ্ঞানের গভীরতা, স্বেচ্ছায় নিয়ম-তন্ত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার শিক্ষা, ধৈর্য্য এবং করুণার প্রসার, স্বার্থপরতাকে দমন করিবার শক্তি, যে-সমস্ত বৃত্তি ধ্বংস আনে তাহাদিগকে সংযত করিবার এবং আকস্মিক খেয়ালের উন্মাদনাকে দমন করিবার উপযোগী ভাবাবেগের দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা—মানুষের জীবনের অন্তরতম প্রদেশে এই সমস্ত বৃত্তির প্রতিষ্ঠার দ্বারাই উন্নততর সামাজিক উৎকর্ষের স্থায়ী সৌধ গড়িয়া তোলা যায়। বস্তুতঃ এইগুলিই তাহার অপরিহার্য্য উপাদান। গুরুতর অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের দ্বারা যে-সব বিশৃঙ্খলা উদ্ভবের সম্ভাবনা আছে, এই সমস্ত গুণ তাহা হইতেও সমাজকে রক্ষা করে। সাধারণতঃ সামাজিক উন্নতির সহিত সমাজের আর্থিক উন্নতির যোগ একান্তই ঘনিষ্ঠ। কারণ আখেরে দেখা যায়, আমাদের অকৃত্রিম ও অবিচল সামাজিক সহযোগিতার উপরেই আমাদের অর্থ-নীতির সাফল্য ও তাহার স্থায়ী আশ্রয় প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত মূল-কারণ উপেক্ষা করিয়া যদি কোনো অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা যায়, তবে তখনই সে-চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সুতরাং নীতি ও সমাজের দিক হইতে যদি আমরা যৌন-সম্পর্কের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির মূল্য আলোচনা করিতে চাই, তবে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি অপরিহার্য্য—আমাদের সমগ্র সামাজিক জীবনের গভীরতা এবং শক্তি বাড়াইতে কোন্ পথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট?—জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় কোন্ পথ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী যাহাতে আমাদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে, ত্যাগ প্রবৃত্তি

উদ্বুদ্ধ হয় এবং অসংযত স্বার্থপরতা ও খেয়ালী উচ্ছৃঙ্খলতা সংযত হয়? এক-বিবাহ প্রথার সামাজিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় মূল্য অপরিমেয়। আর সেই জন্যই এই সব দিক হইতে যখন বিষয়টির বিচার করা হয়, তখন আর কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এক-বিবাহ প্রথা সমস্ত উন্নতিশীল সভ্যতার স্থায়ী সম্পদের একটি অংশ।

প্রকৃত যে উন্নতি তাহা বিবাহ-বন্ধনকে শিথিল করে না—তাহাকে দৃঢ় করিয়া তোলে। * * * জীবনকে সর্ব্বপ্রকারে সমাজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে পরিবার একটি শিক্ষা-কেন্দ্র। অর্থাৎ দায়িত্বজ্ঞান, সহানুভূতি, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা পরস্পরের সাহচর্য্যে শিক্ষা লাভ করা—এ-সমস্তই পরিবারের ভিতর দিয়াই মানুষ লাভ করিবার সুযোগ পায়। পরিবার এই শিক্ষা-ক্ষেত্রের কেন্দ্র-স্থানটি যে অধিকার করিয়া আছে তাহার কারণ—তাহা চিরস্থায়ী—তাহা অচ্ছেদ্য। এই স্থায়িত্বের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কারণ ইহার জন্যই আমাদের সাধারণ পারিবারিক জীবন মানুষের অন্য প্রকার জীবন অপেক্ষা গভীরতর, স্নিগ্ধতর এবং পরস্পরের মিলনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হইয়া আছে। এক-বিবাহ প্রথাকে মানুষের সমস্ত রকমের সামাজিক জীবনের মর্ম্ম-কেন্দ্র বলা যায়।"

এইখানে অগাস্ত কোম্‌তের কথাও এম-বুরো উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—"আমাদের হৃদয় এত সহজে পরিবর্ত্তিত হয় যে, ইহার চাঞ্চল্য এবং খেয়াল সমূহকে সংযত করিবার জন্য সমাজের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য্য। নতুবা উহারা মানুষের জীবনকে কতকগুলি অন্যায় ও উদ্দেশ্যহীন অভিজ্ঞতার ভিতরেই টানিয়া আনিত।"

ডাঃ টুলু বলেন—"প্রেমাবেগের শক্তি অপ্রতিহত, এবং যে কোনো মূল্যেই তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতে হইবে—এই ধরণের একটা মিথ্যা ধারণা আছে এবং তাহাই বহু বিবাহিত দম্পতির আনন্দের অন্তরায়। * * * এই প্রবৃত্তির হাত হইতে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করাই মানব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তাহার ক্রম-বিকাশের সার্থকতা। বালকেরা তাহাদের স্থূল অভাবগুলি জয় করিতে শিখিবে এবং যুবকেরা জয় করিতে শিখিবে তাহাদের প্রবৃত্তি। সমস্ত রকম কল্যাণের সামঞ্জস্য সাধনের এই প্রস্তাব—ইহা মরীচিকাও নয়, কাজে পরিণত করা যায় না—এরূপ বস্তুও নয়। কারণ আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা—যাহাকে আমরা ইচ্ছাশক্তি বলি, বহুল পরিমাণে আমাদের স্বভাব তাহারই অধীনতা স্বীকার করিয়া চলে। মানুষ যখন রুচির আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সাধারণতঃ তাহারা দুর্ব্বলতারই পরিচয় দান করে। যে বাস্তবিক শক্তিমান, সে ঠিক সময়ে শক্তির প্রয়োগ করিতেও জানে।

৮

এখন এই প্রবন্ধের ধারা শেষ করিবার সময় আসিয়াছে। মেলথাসের মতবাদ সম্বন্ধে এম-বুরো যে ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা অনুসরণ করিবার আবশ্যক নাই। মানুষের জন্মের হার অতি মাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছে এবং মনুষ্য সমাজকে যদি লোপ পাইতে না হয়, তবে জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে—এই মতবাদের দ্বারা মেলথাস্ তাঁহার সমসাময়িক জন সঙ্ঘকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহা হইলেও মেলথাস্ সংযমেরই সমর্থক ছিলেন। কিন্তু উগ্র-মেলথাস্-পন্থীরা এই সংযমের সমর্থন করেন না। তাঁহারা পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াও তাহার পরিণাম হইতে উদ্ধারের জন্য সমর্থন করেন ঔষধ-পত্রের এবং যন্ত্রপাতির। এম-বুরো জন্ম-নিরোধের জন্য নৈতিক পথ অবলম্বনের প্রথাকেই অর্থাৎ আত্ম-সংযমকেই অন্তরের সহিত সমর্থন করেন এবং এ-ব্যাপারে ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারকে প্রত্যাহার করিবার জন্যই উপদেশ দেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি যে কত তীব্র তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। গ্রন্থকার অতঃপর শ্রমিকদের অবস্থা এবং তাঁহাদের জন্মের হার লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং এমন কি মানবতার নামে যে ভীষণ দুর্নীতির অভিনয় চলিয়াছে তাহা বন্ধ করিবার উপায়গুলির আলোচনা করিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। পথের সম্বন্ধে তাঁহার ইঙ্গিত হইতেছে—জনমতকে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সু-সম্বদ্ধ চেষ্টা এবং রাজ-শক্তির নিয়োগ করা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহার শেষ নির্ভর হইতেছে মানুষের

ধর্ম্ম জীবনের দ্রুত বিকাশের উপরে। সাধারণ উপায়ের দ্বারা নৈতিক নিঃস্বতার ক্ষতিপূরণ করা যায় না—তাহা আরও অসম্ভব হয়, যখন দুর্নীতিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা হয় এবং নীতিই দুর্ব্বলতা, কুসংস্কার, এমন কি দুর্নীতি বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

বস্তুতঃ কৃত্রিম গর্ভ-নিরোধের সমর্থকদের ভিতর এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা সংযমকে অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া তো মনে করেনই, ইহাকে ক্ষতিকর বলিয়াও মনে করেন। এই অবস্থায় আইন-অনুমোদিত পাপকে বাধা দিতে হইলে সে বাধা কেবল ধর্ম্মই দিতে পারে। ধর্ম্মকে যেন এখানে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা না হয়। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক্ আর সমষ্টিগত জীবনেই হোক্, সত্য-ধর্ম্ম যেমন ঘা দিতে পারে এমন আর কিছুই পারে না। ধর্ম্ম-জাগৃতি বিপ্লব আনে—আমূল পরিবর্ত্তন আনে, পুনর্জ্জন্ম দান করে। এম-বুরোর মতে ফ্রান্স যে ভীষণ নৈতিক ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, এইরূপ একটা বিরাট শক্তি ছাড়া আর কিছুই তাহাকে তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। * *

কিন্তু এইখানেই আমরা গ্রন্থকার এবং তাঁহার গ্রন্থের কথা শেষ করিব। ফ্রান্সের অবস্থা এবং ভারতবর্ষের অবস্থা এক নহে। আমাদের সমস্যা কতকটা অন্য রকমের। কৃত্রিম গর্ভ-নিরোধ প্রথা এখনও ভারতবর্ষের সকলে গ্রহণ করে নাই। শিক্ষিত সমাজেও উহার ব্যবহার কদাচিত দেখা যায়। আমার মতে উল্লেখ-যোগ্য এমন কোনো অবস্থাই ভারতবর্ষে ঘটে নাই যে জন্য তাহাকে কৃত্রিম গর্ভ-নিরোধের প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পিতামাতা কি অতিরিক্ত পুত্র-কন্যার ভারে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছেন? দুই একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর

জন্ম-সংখ্যা যে অসঙ্গত ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা প্রমাণ করা যাইবে না। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বিধবা এবং অল্পবয়স্কা পত্নীদের ভিতরেই কৃত্রিম গর্ভ-নিরোধ প্রথা অবলম্বনের চেষ্টা দেখা যায়। এইরূপে দেখা যায়, এক ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা গোপন যৌন-সম্মিলন নহে—জারজ সন্তান উৎপাদনই এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, অল্পবয়স্কা বালিকাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করা নহে—বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে তাহাদের গর্ভ-সঞ্চারের। অতঃপর বাকি থাকে ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বল, নিস্তেজ একদল যুবক যাহারা নিজের পত্নী অথবা পর-স্ত্রীর সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় ইন্দ্রিয় সেবায় নিরত থাকে এবং যাহা তাহারা পাপ বলিয়া জানে এইরূপে তাহার পরিণাম এড়াইয়া চলিতে চায়। আমি অকুণ্ঠিত ভাবে বলিতে পারি, যাহারা সুস্থ এবং সবল তাহাদের ভিতর যৌন-সম্মিলন চায় অথচ পুত্র কন্যার ভার বহনে অনিচ্ছুক—ভারতবর্ষের এই বিরাট জন-সমুদ্রের ভিতর সেরূপ লোকের সংখ্যা খুবই বিরল। যে অল্প সংখ্যক লোক সেরূপ আছে তাহারা যেন তাহাদের কাজকে সমর্থন করিয়া ভারতবর্ষে এই প্রথার ওকালতী করিয়া না বেড়ায়। কারণ 'এ-প্রথা যদি সর্ব্বসাধারণের ভিতর চলিতে থাকে, দেশের যুবক-যুবতীদিগকেই যে তাহা ধ্বংস করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। একটি অত্যন্ত কৃত্রিম শিক্ষা-পদ্ধতি জাতির যুবকদের শারীরিক এবং মানসিক তেজকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাল্য বিবাহের ফল হইতে আমরা উৎপন্ন। স্বাস্থ্য এবং আবেষ্টনের নিয়ম না মানার ফলে আমাদের দেহ দুর্ব্বল। উত্তেজক মশলার দ্বারা আমাদের খাদ্য পরিপূর্ণ। আহার সম্পর্কে ভ্রান্ত এবং প্রমাদপূর্ণ আদর্শ অনুসরণ করায় আমাদের পরিপাক-যন্ত্র ধ্বংসোন্মুখ। সুতরাং পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কৃত্রিম গর্ভ-নিরোধ-

প্রথা সম্বন্ধে শিক্ষার আমাদের প্রয়োজন নাই—আমাদের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রয়োজন সেই শিক্ষার যাহাতে এই ক্ষুধা দমন করিতে শিখায়, যাহাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিবার শক্তিও আমাদের জাগ্রত হয়। দৃষ্টান্তের দ্বারা, আদর্শের দ্বারা এই শিক্ষাই আমাদিগকে দেওয়া দরকার যে, সংযম পালন করা সম্পূর্ণ ভাবেই সম্ভব, এবং যদি আমরা শরীরে ও মনে দুর্ব্বল হইয়া থাকিতে না চাই, তবে এই সংযম পালন করা একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। উচ্চ কণ্ঠে এই কথাই আজ বলা দরকার যে, যদি আমরা বামনের জাতিতে পরিণত হইতে না চাই, তবে যে সামান্য জীবনী-শক্তি আমাদের আছে এবং যাহা আমরা প্রতিদিন ক্ষয় করিতেছি, ক্ষয় কমাইয়া তাহাই আমাদের বাড়াইতে হইবে—তাহাকেই সঞ্চয় করিতে হইবে। যুবতী বিধবাদিগকে আমাদের বলিতে হইবে—তাহারা যেন গোপনে পাপ না করে, তাহারা যেন প্রকাশ্যে নির্ভীকভাবে বিবাহ করিতে চায়। কারণ, অল্প-বয়স্ক বিপত্নীকদের আবার বিবাহ করিবার যে অধিকার আছে, সে অধিকার রহিয়াছে তাহাদেরও। জন-মতকে আমাদের সেই ভাবেই গঠন করিতে হইবে যাহাতে বাল্য বিবাহ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অব্যবস্থিত চিত্ততা, কঠিন এবং যে কাজে লাগিয়া থাকিতে হয় সে কাজে অনাসক্তি, শ্রমসাধ্য কাজে অক্ষমতা, উৎকৃষ্ট আরম্ভের বর্জ্জন, মৌলিকতার অভাব—যাহা আমাদের ভিতর সাধারণতঃ দেখা যায়—ইহাদের বেশীর ভাগই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচলনার ফল। আমি আশা করি, যুবকেরা একথা বলিয়া কখনো আত্ম-বঞ্চনা করিবে না যে, সন্তান যদি উৎপন্ন না হয় তবে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় পরিচালনায় বিশেষ কিছুই যায় আসে না—তাহা দেহকে দুর্ব্বল করে না। বস্তুতঃ দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া মানুষ যখন

যৌন-সঙ্গম করে তখন যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহার চেয়ে ঢের বেশী শক্তি ক্ষয় হইয়া থাকে যখন জন্ম-নিরোধের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যায় নিরত হয়।

"মনের মাঝেই শক্তি আছে—এই শক্তিরই প্রভাবেতেই জানি,
নরক ওঠে স্বর্গ হ'য়ে—স্বর্গে নামে নরকেরই গ্লানি।"

যদি একথা মনে করা যায় যে, পশু-প্রবৃত্তির পরিচর্য্যা প্রয়োজন, তাহা হানিকর নহে এবং তাহাতে পাপও নাই, তবে তাহার লাগাম আমরা আল্‌গা করিতেই থাকিব—তাহাকে দমন করিবার শক্তিও আমাদের থাকিবে না। পক্ষান্তরে যদি এই বিশ্বাসই আমাদের ভিতর জাগ্রত হয় যে, ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা অন্যায়, হানিকর এবং অপ্রয়োজনীয়, তবে আত্মসংযম যে সম্পূর্ণ সম্ভব তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব। নূতন সত্য এবং তথাকথিত স্বাধীনতা নাম দিয়া প্রতীচী স্বেচ্ছাচারের যে তীব্র মদিরা এদেশে প্রেরণ করিতেছে সে সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি আমাদের পিতৃ-পিতামহদের জ্ঞানকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছি বলিয়া মনে করি, তবে পশ্চিমেরই জ্ঞানীদের গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত গম্ভীর বাণী—যাহা সময়ে সময়ে আমাদের কাছে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসিয়া পৌঁছিতেছে, অন্ততঃ সেই সব বাণী সম্বন্ধেই আমাদের সচেতন হইয়া উঠা দরকার।

চার্লি এণ্ড্রুজ জন্ম এবং অন্তর্জন্ম সম্বন্ধে উইলিয়াম লোফটাস্ হেয়ারের লেখা একটি বহু তথ্য-পূর্ণ প্রবন্ধ আমার কাছে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি ১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসে "The Open Court" নামক

পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি যুক্তিতে ভরা। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরই দুইটি কাজ করে—শরীর গঠনের জন্য আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি, এবং শ্রেণী বা জাতি বিভাগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বাহিরের সৃষ্টি। এই প্রক্রিয়াকে তিনি যথাক্রমে নাম দিয়াছেন অন্তর্জন্ম এবং জন্ম। "অন্তর্জন্ম বা আভ্যন্তরীণ জন্ম ব্যক্তি-জীবনের মূল বস্তু—সুতরাং তাহার পক্ষে মুখ্য প্রয়োজন। জন্ম ব্যাপার দেহ-কোষের প্রাচুর্য্যের ফল—সুতরাং তাহা গৌণ। * * এ অবস্থায় জীবনের ধর্ম্ম—বীজ-কোষগুলিকে প্রথমতঃ আভ্যন্তরীণ সৃষ্টির জন্য তারপর প্রজননের জন্য আহার দান করা। এই আহার্য্য যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে, তবে আগে লক্ষ্য রাখিতে হইবে আভ্যন্তরীণ সৃষ্টির দিকে এবং প্রজননের কাজ তখন বন্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপে আমরা প্রজনন-ক্রিয়া বন্ধ রাখা এবং তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা—সংযম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের মূলে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সৃষ্টির পথ মৃত্যু ছাড়া বন্ধ করা যায় না—বস্তুতঃ উহাই মৃত্যুর কারণ।" প্রজননের দৈহিক পদ্ধতির বর্ণনা শেষ করিয়া লেখক বলিতেছেন—"সভ্য সমাজে যৌন-ক্রিয়া এরূপ ভাবে সম্পন্ন করা হয় যে, পরবর্ত্তী বংশধরদের জন্মের জন্য যতটুকু দরকার তাহা অপেক্ষা তাহার মাত্রা ঢের বেশী ছাড়াইয়া যায়। ফলে আমাদের আভ্যন্তরীণ সৃষ্টিতে বাধা পড়ে—এবং ব্যাধি, মৃত্যু ও অন্যান্য দুঃখ দেখা দিতে থাকে।"

হিন্দু-দর্শনের সামান্য জ্ঞানও যাহার আছে তাহার পক্ষে মিঃ হেয়ারের প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশটি বোঝা কিছু মাত্র কঠিন নহে।—"অন্তর্জন্মের

প্রক্রিয়া যান্ত্রিক ব্যাপার নহে, আদিম সৃষ্টি-শক্তির মতোই তাহা প্রাণবন্ত, অর্থাৎ তাহার ভিতর বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব দেখা যায়। ধরা-বাঁধা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে জীবনের কাজ চলে—একথা ধারণা করাও অসম্ভব। তবে একথা সত্য যে, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান হইতে এই মূল-গত পদ্ধতিগুলি এখনও এত দূরে রহিয়াছে যে, তাহারা যে জীবের ইচ্ছা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—একথা মনে করা কঠিন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায়, পরিণত-বয়স্ক মানুষের বাহিরের চলা-ফেরা যেমন তাহার বুদ্ধির আওতায় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি দেহের ভিতরকার বিধি-ব্যবস্থা পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী এক ভিন্ন রকমের জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত ভিন্ন রূপ একটি ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই সঙ্গত। মনোবিজ্ঞানবিদেরা এই অবস্থার নাম দিয়াছেন সুপ্ত চৈতন্য। ইহা আমাদের সত্ত্বারই একটা অঙ্গ, দৈনন্দিন সাধারণ চিন্তা-ধারার সহিত ইহার যোগ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও নিজের কাজের সম্বন্ধে ইহা অতিমাত্রায় সচেতন—এত সচেতন যে, আমাদের চেতনাও কখনো কখনো ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু ইহা কখনো নিদ্রামগ্ন হয় না।”

ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা যখন কেবলমাত্র ভোগের জন্যই করা হয় তখন আমাদের সত্ত্বার—এই সুপ্ত চৈতন্যের এবং অধিকতর স্থায়ী অঙ্গের যে কি গভীর ক্ষতি করা হয় কে তাহার পরিমাপ করিবে! জন্ম যে প্রতিহিংসা গ্রহণ করে তাহা মৃত্যু। যৌন-সম্মিলনের ফলে পুরুষ অগ্রসর হয় মৃত্যুর দিকে এবং সন্তান-প্রসব ফলে নারী মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলে।” এই জন্যই গ্রন্থকার বলেন—“যাহারা অত্যন্ত অপরিমিতভাবে

যৌন-সম্ভোগ করে, অথবা যাহারা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মচারী, ওজস্বিতা ও জীবনী শক্তি সাধারণতঃ তাহারাই লাভ করে ও তাহারাই সাধারণতঃ ব্যাধিহীন হয়। বীজ-কোষের দেহগঠন পদ্ধতিতে বাধা দিয়া তাহার ঊর্দ্ধগতি যখন বন্ধ করা হয় এবং কেবলমাত্র প্রজননের জন্য অথবা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার জন্য তাহাকে ব্যবহার করা হয় তখন জীবনের ক্ষয় পূরণের যন্ত্রগুলিকে ধীরে ধীরে নিঃসংশয়রূপেই বঞ্চিত করা হইয়া থাকে।”

“দেহ সম্পর্কীয় এই সব সত্যই মানুষের ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার নীতির মূল ভিত্তি। ইহার দ্বারা, সম্পূর্ণ সংযম না আসিলেও সংযতভাবে ইন্দ্রিয় সেবার বুদ্ধি আসে, অন্ততঃপক্ষে সংযমের উদ্ভবের কারণ বুঝা যায়।”

অতঃপর সহজেই বোঝা যায় যে, গ্রন্থকার জন্ম-নিরোধের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতী ব্যবহারের বিরোধী। তিনি বলেন—“আত্মসংযমের সদ্বিচার প্রসূত উপায়গুলিকে ইহা তো ব্যর্থ করেই, ইচ্ছা না কমা পর্য্যন্ত অথবা বৃদ্ধত্ব না আসা পর্য্যন্ত বিবাহিত জীবনেও যৌনচর্য্যার আতিশয্য ইহা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। ইহা ছাড়া বিবাহ সম্পর্কের বাহিরেও ইহার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার ফলে অনিয়মিত, অসংযত এবং নিষ্ফল যৌন-মিলনের পথও খুলিয়া যায়। বর্ত্তমান শিল্প, সমাজ এবং রাজনীতির দিক দিয়া ইহা বিপজ্জনক। এখানে এই সমস্ত জিনিষের আলোচনা চলে না। এখানে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, কৃত্রিম গর্ভ-নিরোধ-ব্যবস্থা, বিবাহিত জীবনে এবং বিবাহের বাহিরেও অস্বাভাবিক অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যার সুবিধা আনিয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে দেহ সম্বন্ধে আমি যে-সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছি তাহা যদি ঠিক হয় তবে ইহার দ্বারা ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েরই ক্ষতি হয়।”

যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া এম-বুরো তাহার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, ভারতীয় যুবকদের তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত। পংক্তিটি এই—"যে জাতি সংযমী দুনিয়ার ভবিষ্যৎ তাহারই হাতে।"

জন্ম-নিরোধ

অত্যন্ত সঙ্কোচ এবং অনিচ্ছার সঙ্গেই আমি এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতেই কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধে অনেকে পত্র লিখিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে পত্র লিখিয়া যদিও আমি তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি, আমি এ-পর্য্যন্ত এ-সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করি নাই। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ইংলণ্ডে ছাত্ররূপে বাস করিতেছিলাম, আমার দৃষ্টি তখনই বিষয়টির দিকে আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা পবিত্রতাবাদী, অর্থাৎ যাঁহারা স্বাভাবিক ভাবে জন্ম-নিরোধ ছাড়া অন্যভাবে গর্ভ-নিরোধের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহাদের সহিত যে-সব ডাক্তার কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ-নিরোধের পক্ষপাতী তাঁহাদের সেই সময়েই একটা তীব্র মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইয়াছিল। জীবনের সেই তরুণ অবস্থাতে প্রথমে কৃত্রিম উপায়ের দিকে আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম সত্য, কিন্তু সে কেবল কিছুদিনের জন্য। তারপরেই ব্যাপারটি বুঝিয়া আমি উহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াই। সম্প্রতি আমি কয়েকখানি হিন্দী পত্রিকাতে এই পদ্ধতিগুলি প্রকাশ্যে এমন ভাবে আলোচিত হইতে দেখিয়াছি• যাহা সুরুচির সীমাকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। আমি আরও দেখিয়াছি যে, একজন লেখক আমাকেও তাঁহাদেরই দলভুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ-নিরোধ সমর্থন করেন। আমার এমন একটা ঘটনার কথাও মনে পড়ে না যখন আমি এই সব পদ্ধতির সপক্ষে কোনো কথা বলিয়াছি বা লিখিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও

দুইটি বিখ্যাত নাম এই সব পদ্ধতির সমর্থক রূপে আমি উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া নাম দুইটির উল্লেখ করা আমি সঙ্গত মনে করি না।

জন্ম-নিরোধের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কিন্তু তাহার উপায় মাত্র একটি—আত্মসংযম অথবা ব্রহ্মচর্য্য, এবং এ-উপায় সেই চিরন্তনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করেন, কল্যাণ তাঁহাদের কেহই রোধ করিতে পারে না। যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাঁহারা যদি গর্ভ-নিরোধের কৃত্রিম উপায়াদির উদ্ভাবন না করিয়া আত্মসংযমের কোনো সহজ উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন, তবে তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। যৌন-সম্মিলন দৈহিক সুখের জন্য নহে, সন্তান উৎপাদনের জন্য। যৌন-সম্মিলনের ভিতর যখন সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্য না থাকে তখন তাহা পাপ।

কৃত্রিম পদ্ধতিগুলি পাপের সাহায্য করারই অনুরূপ। নর-নারীকে তাহা উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে। পদ্ধতিগুলির উপর যে গৌরব আরোপ করা হইতেছে তাহার দ্বারা, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যার উপরে জন-মত যে বাধার সৃষ্টি করে তাহাও নষ্ট করিয়া দেয়। কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের ফলে ক্লীবত্ব ও স্নায়বিক অক্ষমতা আসে। তখন ব্যাধি অপেক্ষা ব্যাধির প্রতিকারই গুরুতর হইয়া উঠে। নিজের কৃত-কর্ম্মের ফল এড়াইবার চেষ্টা করা গর্হিত ও অন্যায়। যে অতিরিক্ত খায় তাহার যদি পেটে ব্যথা হয় এবং উপবাস দিতে হয় তবে তাহার দ্বারা তাহার কল্যাণই হয়। অতিরিক্ত ভোজন করিলে এবং তাহার ফল এড়াইবার জন্য নানা রকমের ঔষধের

ব্যবহার করিলে তাহাতে শুভ হয় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও খারাপ জিনিষ হইতেছে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করা ও তাহার ফল এড়াইবার জন্য চেষ্টা করা। প্রকৃতি অত্যন্ত নিষ্করুণ, তাহার নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সে সম্পূর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করে। ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু—এই যুক্তিই কৃত্রিম পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারের মূলে আছে দেখা যায়। কিন্তু এ-যুক্তির মতো ভুল যুক্তি আর কিছুই হইতে পারে না। যাঁহারা জন্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চা'ন তাঁহারা যেন প্রাচীনদের ন্যায়-সঙ্গত প্রথাগুলি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, এবং তাহাদের পুনঃপ্রচলনের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁহাদের সাম্‌নে বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। বাল্য-বিবাহ জন-বৃদ্ধির একটি উপায়। বর্ত্তমানে আমরা যে ভাবে জীবন যাপন করি তাহার দ্বারাও জন্মের হার অন্যায় ও অপ্রতিহত ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে। যদি এই সব কারণের অনুসন্ধান করা যায় এবং তাহাই লইয়া আলোচনা করা যায়, তবে সমাজের নৈতিক উন্নতি যে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যদি অসহিষ্ণু গোঁড়াদের দ্বারা উপেক্ষিত হয় এবং কৃত্রিম উপায়গুলিই ব্যবহৃত হইতে থাকে, তবে তাহার ফল নৈতিক অবনতি ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

নানা কারণে সমাজ ইতিমধ্যেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। যদি কৃত্রিম উপায়গুলি ব্যবহৃত হইতে থাকে তবে তাহা আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সুতরাং অত্যন্ত শিথিল ভাবে আলোচনা করিয়া যাঁহারা কৃত্রিম পদ্ধতিগুলির ওকালতী সুরু করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের বিষয়টি আবার নূতন করিয়া আলোচনা করা দরকার এবং এই হানিকর প্রচার থামাইয়া বিবাহিত ও

অবিবাহিত উভয়ের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য যে আবশ্যক তাহাই দেখাইয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যই জন্ম-নিরোধের একমাত্র সাধু এবং সহজ উপায়। *

* ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

কয়েকটি যুক্তি সম্বন্ধে বিচার

জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহা উগ্র আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছে। কৃত্রিম উপায় সমূহের সমর্থন করিয়া অনেকে আমাকে পত্র লিখিতেছেন। এরূপ যে হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমি চা'রখানি পত্র পাইয়াছি। চতুর্থ পত্রখানির বেশীর ভাগই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা সুতরাং সেখানা বাদ দেওয়া গেল। বাকী তিন খানি পত্রের একখানি এইরূপ ঃ—

"আমি আপনার জন্ম-নিরোধ সম্পর্কীয় প্রবন্ধটি মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিয়াছি। বর্ত্তমানে বহু শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি বিষয়টি সম্পর্কে আকৃষ্ট হইয়াছে। গত বৎসর ইহাই লইয়া আমাদের ভিতর বহু দীর্ঘ এবং উত্তেজিত আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সব তর্কের দ্বারা এ-কথাটা অন্ততঃ প্রমাণিত হয় যে, যুবকেরা সত্য সত্যই এ-সমস্যাটি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এ-সম্বন্ধে আমাদের ভিতর যথেষ্ট কুসংস্কার আছে, এবং খোলাখুলি ভাবে ইহা লইয়া আলোচনা করায় আমাদের সুরুচি আহত হয়—এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। আপনার প্রবন্ধটি আমাকে এ-সম্বন্ধে আবার নূতন করিয়া চিন্তার সুযোগ দিয়াছে। যে সমস্ত সন্দেহ আমার মনে জাগ্রত হইয়াছে তাহার সমাধানের জন্য আমি আরও কিছু আলোক যাচ্ঞা করিতেছি।

" 'জন্ম-নিরোধের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে না'—একথা আমিও স্বীকার করি। তাহা ছাড়া আমি এ-কথাও স্বীকার করি যে, 'ব্রহ্মচর্য্য ইহার অপরিহার্য্য শ্রেষ্ঠ উপায় এবং যাঁহারা এ-উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদের কল্যাণ না হইয়াই পারে না।' কিন্তু এখানে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে—তাহাই যদি হয়, তবে এ ক্ষেত্রে যে সমস্যা তাহা 'জন্ম-নিরোধের' না 'আত্মসংযমের'। সমস্যা আত্মসংযমের হইলে—সাধারণ লোকের পক্ষে আত্মসংযমের দ্বারা জন্ম-নিরোধ করা সম্ভবপর কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয় হইয়া পড়ে।

"আমার বিশ্বাস এ-সমস্যাটি দুই বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা যায়—ব্যক্তির দিক হইতে এবং সমাজের দিক হইতে। ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, সে তাহার ইন্দ্রিয়-লালসাকে সংযত করিবে এবং এইরূপে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করিবে। সমস্ত যুগেই অল্পসংখ্যক দুই চারিজন লোক থাকেন যাঁহাদের নৈতিক ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ়, যাঁহাদের সাম্‌নে একটি মহৎ আদর্শ আছে এবং সেই আদর্শকেই তাঁহারা অনুসরণ করিয়া চলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে জন্ম-নিরোধ সমস্যার কোনো অনুভূতি আছে কিনা এবং এই সমস্যার সমাধান করিতে তাঁহারা চা'ন কিনা—সে-সম্বন্ধে আমায় যথেষ্ট সংশয় আছে। সন্ন্যাসী মুক্তির অন্বেষণেই বাহির হইয়াছে, জন্ম-নিরোধ সমস্যার সমাধান তাহার সাধনার অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে।

"সে যাহা হোক্, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক যে সমস্ত সমস্যা বিপুল জন-সঙ্ঘের কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়, পূর্ব্বোক্ত পথটি যুক্তি-সঙ্গত সময়ের ভিতরে তাহার সমাধান করিতে পারে কিনা তাহাও বিচার করিয়া দেখা দরকার। চিন্তাশীল প্রত্যেক গৃহস্থই এ-সমস্যার

সমাধানের প্রয়োজনীতা অনুভব করে। একজন লোক কয়টি শিশুকে ভরণ-পোষণ করিতে পারে, শিক্ষা দিতে পারে, জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে—এ-প্রশ্ন সমাধানে আর দেরী করা চলে না। আপনি লোক-চরিত্র জানেন। জানিয়াও কি আপনি আশা করিতে পারেন যে, সন্তানোৎপাদনের প্রয়োজন শেষ হইলেই বহু লোক যৌন-সম্ভোগও সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া চলিবে? আমার বিশ্বাস—স্মৃতি-কারদের অনুমোদিত সংযত ও পরিমিত যৌন-সম্ভোগে আপনারও আপত্তি নাই। বিপুল জন-সঙ্ঘকে এই কথাই বলা যায় যে, তোমরা অতিরিক্ত ভাবে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিও না; কিংবা তাহা একেবারে বর্জ্জন করিও না—কেবল সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তাহার পরিচালনা করিও। কিন্তু এরূপ করিতে হইলেও কি এই উপায়ের দ্বারা জন্মের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা যাইবে? আমার বিশ্বাস আপনার প্রদর্শিত পদ্ধতির দ্বারা ভালো লোকের জন্ম দানই সম্ভব হইবে, জন্মের হার কমানো সম্ভবপর হইবে না। প্রকৃতপক্ষে নিকৃষ্ট লোকের অপেক্ষা উন্নত ধরণের লোক যদি বাড়িতে থাকে তবে জন-সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে। গরু প্রভৃতির জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ভালো জীবের উৎপাদনই সম্ভবপর হইয়াছে, জন্মের হার কমে নাই

"যৌন-সম্মিলন সুখ ভোগের জন্য নহে, সন্তানোৎপাদনের জন্য—এ-কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলেও এ-কথা স্বীকার করিতে হয় যে, সুখেচ্ছা ইহার একমাত্র কারণ না হইলেও প্রধান কারণ। সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা প্রকৃতিরই রচিত একটি প্রলোভন। সঙ্গে সঙ্গে যদি সুখের অনুভূতিও না থাকিত তবে কয়জনে এ-উদ্দেশ্য পালন করিত?

যেখানে সুখের অনুভূতি নাই, সেখানে কয়জনেই বা ইহা পালন করে? কত জনেই বা সুখেচ্ছায় যৌন-সম্ভোগ করে এবং তাহার ফলে পুত্র উৎপন্ন হয়, আর কয়জনই বা পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছায় সঙ্গমে রত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পায় সুখেরও অনুভূতি? আপনি লিখিয়াছেন—'যেখানে পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা নাই সেখানে যৌন-সম্মিলন অপরাধ।' আপনার ন্যায় যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহাদের পক্ষেই এ-কথা বলা শোভা পায়, কারণ এ-কথা তো আপনিই বলিয়াছেন যে, প্রয়োজনের বেশী যে সঞ্চয় করে সে চোর—সে দস্যু এবং যে পরকে ভালো না বাসে সে নিজেকেও ভালোবাসে না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, দুর্ব্বল মানুষের প্রতি আপনিই বা এত বিরূপ কেন? সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছা না রাখিয়াও যদি তাহারা সুখ-ভোগে রত হয়, তবে তাহাও তো তাহাদিগকে একটু তৃপ্তি দেয়—তাহাদের দেহ-মনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের রসদ যোগায়! সন্তানোৎপাদনের ভয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহে বিলম্ব ঘটায়। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই সন্তানোৎ-পাদনের ইচ্ছা সাধারণতঃ দূর হইয়া যায়। তাহার পর যখন কেহ ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা করে, সে কি অপরাধ করে? আপনি কি মনে করেন যে, যদি কেহ অপরাধ করার ভয়ে অশান্ত রিপুর আঘাত সহ্য করে, তবে নৈতিক হিসাবে সে শ্রেষ্ঠতর মানুষ হয়? যাহারা প্রয়োজনের বেশী সঞ্চয় করে সেই সব 'চোর'কেও আপনি সহ্য করেন, কিন্তু যাহারা পুত্রোৎপাদনের ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হওয়ার পর ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করে সেই সব 'অপরাধী'কে আপনি সহ্য করিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ 'চোরে'র সংখ্যা এত বেশী এবং তাহারা এতই শক্তিমান যে তাহাদের সংস্কার অসম্ভব

"সর্ব্বশেষে, আপনি বলিয়াছেন—'কৃত্রিম উপায়ের ব্যবহার পাপের "প্রিমিয়ামের' মত। তাহা নর-নারীকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে।' এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে এ-অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। আমি জিজ্ঞাসা করি, ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার আতিশয্যে বাধা দিবার জন্য জন-মত কি কখনো যথেষ্ট প্রবল ছিল? জন-মতের জন্য মদ্যপকে পানাসক্তি কমাইতে হইয়াছে—তাহা আমি জানি। কিন্তু অন্য দিকে এই সব উক্তিই তো শুনিয়া আসিতেছি যে, 'ভগবান কেবল মুখই দেন নাই, রক্ত-মাংসও দিয়াছেন,' 'ভগবানের ইচ্ছাতেই ছেলে মেয়ে হইতেছে।' এতদ্ব্যতীত এ-কুসংস্কারও তো লোকের আছে যে, বেশী পুত্র-কন্যার জন্ম দান করা পৌরুষের লক্ষণ। এমন অনেক ঘটনা আমি জানি যেখানে এই সব মত স্ত্রীর উপরে স্বামীর যদৃচ্ছা ব্যবহারের অধিকার দিয়াছে এবং যৌন-সম্মিলনই বিবাহের প্রধান বন্ধন—এ অনুভূতিও আনিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া ইহা কি সত্য যে, কৃত্রিম পদ্ধতির অবলম্বনে ক্লীবত্ব ও স্নায়বিক অক্ষমতা আসে? নানা রকমের পদ্ধতি আছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে, বিজ্ঞান আরও বহু পদ্ধতির আবিষ্কার করিবে। ইহা মানুষের বুদ্ধির অগম্য বস্তু নহে।

"কিন্তু মনে হয়—কোনো ক্ষেত্রেই এই সব পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি আপনার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। কারণ 'নিজের কৃতকর্ম্মের ফল এড়াইতে চেষ্টা করা অন্যায় এবং নীতি-বিরুদ্ধ।' ইহা প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই সত্য। সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছা ছাড়া অত্যন্ত সংযত ভাবে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিটাইবার চেষ্টা করাকেও আপনি নীতি-বিগর্হিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—কেহ কি কখনো সন্তানোৎপাদনের ভয়ে নিজের কৃতকর্ম্মের ফল এড়াইবার জন্য আপনাকে

সংযত করিয়াছে? অনেকে স্বাস্থ্য এবং সুখের সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া হাতুড়ে ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করে। কৃতকর্ম্মের ফল এড়াইবার চেষ্টায় কত গর্ভ-নিপাতের ব্যবস্থাই না অবলম্বিত হইয়াছে। যদি বা ভয় বাধার সৃষ্টি করে, তাহার নৈতিক ফল হয় কি শোচনীয়! তাহা ছাড়া কোন্ ন্যায়ের নীতি অনুসারে পিতামাতার পাপের ফল পুত্রকে ভোগ করিতে হইবে এবং সমাজকে সহ্য করিতে হইবে ব্যক্তি-বিশেষের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল? এ-কথা কি সত্য যে, 'প্রকৃতি অত্যন্ত নিষ্করুণ এবং এই ধরণের যে কোনো নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সে সম্পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে?' কিন্তু এ-কথাই বা কেন ধরিয়া লওয়া হয় যে, কৃত্রিম পদ্ধতির প্রয়োগ এই রকমের একটি নিয়ম লঙ্ঘনেরই ব্যাপার? কৃত্রিম দাঁত, চোখ, বা অন্য কোনো অঙ্গের ব্যবহারকে তো অস্বাভাবিক বলিয়া অভিহিত করা হয় না। তাহাই তো অস্বাভাবিক যাহা আমাদের শুভকে সুরক্ষিত করে না। 'মানুষ স্বাভাবতঃই পাপাসক্ত'—এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না এবং এ-কথাও বিশ্বাস করি না যে, 'এই সব পদ্ধতির ব্যবস্থা তাহাদের অবস্থাকে অধিকতর শোচনীয় করিয়া তুলিবে।' এ-যুগেও প্রচুর ব্যভিচার আছে এবং এমন কি ভারতবর্ষও তাহার হাত হইতে মুক্ত নহে। এ-কথা প্রমাণ করা সহজ যে, এই নূতন শক্তি যথাযথ ভাবেও যেমন প্রযুক্ত হইবে, তেমনি ইহার অপব্যবহারও হইবে। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতে হয় যে, মানুষ প্রকৃতির উপরে জয় লাভের একটি অসাধারণ যন্ত্র আবিষ্কার করিবার উপক্রম করিয়াছে এবং কেবল আমাদের ক্ষতির মূল্যেই এ শক্তিকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি। ইহাকে পরিত্যাগ করা নহে, ইহাকে ঠিক ভাবে পরিচালিত করার উপরেই

বুদ্ধির সার্থকতা নির্ভর করে। মহত্তর কর্ম্মীদের ভিতরেও কেহ কেহ এই সব পদ্ধতির প্রচলন করিতে চা'ন—অসংযত ভাবে ইন্দ্রিয়-পরিচালনার জন্য নহে, আত্ম-নিয়ন্ত্রণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। এ-কথাও বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, নারী এবং তাহার প্রয়োজনকে আমরা দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়াছি। তাহারও এ-সম্বন্ধে বলিবার আছে। মানুষ যে তাহার দেহকে সন্তানোৎপাদনের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিবে—আজ সে তাহাতে তাহার অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে।

"বর্ত্তমান সভ্যতার চাপ এতই গুরুতর যে, নারীর পক্ষে আর বড় পরিবার প্রতিপালনের ঝঞ্ঝাট এবং দুঃখ বহন করা অসম্ভব। নারীরা স্নায়বিক অবসাদে অশক্ত হইয়া পড়িতেছে—এ অবস্থা ডাঃ মেরী ষ্টোপ্স্ এবং মিস্ এলেন কি প্রমুখ মহিলারা আর দেখিতে রাজি নহেন। তাঁহারা যে-সব পদ্ধতির কথা বলেন, নারীরাই প্রধানতঃ তাহা কাজে খাটাইতে পারে এবং আশা করা যায়, তাহার ফলে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার অসঙ্গত অসংযমের পরিবর্ত্তে, সুচিন্তিত মাতৃত্বেরই উদ্ভব হইবে। সে যাহাই হোক্, এরূপ অবস্থাও আসে, যখন ছোট পাপের দ্বারাও বড় পাপকে ঠেকানো প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এমন অনেক ভীষণ ব্যাধি আছে স্নায়বিক অবসাদের বিনিময়েও যাহা এড়ানো দরকার। এমন অবস্থাও আছে যখন ইন্দ্রিয়-সঙ্গম অপরিহার্য্য —কিন্তু সেই সঙ্গমের ফলে সন্তান হইলেই তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয় এমন স্ত্রীলোকও দেখা যায়, অন্য সব দিক দিয়াই যাহারা বেশ সুস্থ, অথচ কেবল তাহাদের সন্তান-সম্ভাবনা হইলেই জীবনের আশঙ্কা দেখা দেয়।

"আপনি জন্ম-নিরোধের আন্দোলনের পাণ্ডায় পরিণত হইবেন—তাহা আমি ইচ্ছা করি না—আশাও করি না। যে সত্য এবং ব্রহ্মচর্য্য পবিত্রতার আলোকে উজ্জ্বল তাহা আপনার সঙ্গে চমৎকার খাপ খায়। যাহারা চায় তাহাদিগকে আপনি উহা দান করুন। কিন্তু মূর্খ জনক-জননী অপেক্ষা বিজ্ঞ পিতামাতাই সে আলোকের কামনা করিবে। জন্ম-নিরোধের প্রয়োজন সম্বন্ধে যাহার ধারণা আছে তাহার পক্ষে আত্মসংযমও সহজ। বর্ত্তমানে ব্যভিচার, চিন্তার দীনতা এবং অজ্ঞতা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, আপনি যতই চীৎকার করুন না কেন, তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায়ই নিরর্থক। আপনি 'দ্বিধা এবং অনিচ্ছা' সঙ্গে এ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু ঢের বেশী জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা এ বিষয়ে হওয়া আবশ্যক। আপনি যদি এ আলোচনায় যোগ দিতে না-ও পারেন, তবু ইহার উপযোগিতা আপনার স্বীকার করিয়া লওয়া সঙ্গত এবং যদি প্রয়োজন হয়, তবে ঠিক সময়ে এ আন্দোলন পরিচালিত করার ভার লওয়াও কর্ত্তব্য। কারণ ইহার সম্মুখে বিপদের তরঙ্গ রহিয়াছে। বিপদের সময় চোখ বুঁজিয়া থাকায় এবং তাহার সম্মুখীন হইতে ইতস্ততঃ করায় কোনো লাভ নাই।"

গোড়াতেই পরিষ্কার করিয়া বলা ভালো যে, আমি প্রবন্ধটি সন্ন্যাসী রূপেও লিখি নাই—সন্ন্যাসীদের জন্যও লিখি নাই। 'সন্ন্যাসী' শব্দ দ্বারা যাহা বুঝায় আমি কখনো তাহার দাবীও করি না। আমার মন্তব্য আমার নিজের অক্ষুণ্ণ ব্যক্তিগত অভ্যাসের ফল। ২৫ বৎসরের মধ্যে তাহার সামান্যই ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়াছে। তাহা ছাড়া আমার নিজের অভিজ্ঞতার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যাঁহারা এই পরীক্ষায় আমার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং একটা সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে এরূপ দীর্ঘ

দিন যাঁহারা এ পথের অনুসরণ করিয়াছেন। এই পরীক্ষায় আমার সঙ্গে যুবা-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকল রকমের লোকই আছেন এবং এ-সম্বন্ধে খানিকটা বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার দাবীও আমি করিতে পারি। নৈতিক ভিত্তির উপরেই যে ইহা প্রতিষ্ঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু জন্ম-নিরোধের ইচ্ছা হইতেই ইহার উদ্ভব। আমার বেলায় বিশেষভাবে উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। পরবর্ত্তী চিন্তার দ্বারা বিরাট নৈতিক ফল লাভ করা গিয়াছে এবং ফলও অর্জ্জিত হইয়াছে একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই। এ-কথা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি, বিচারপূর্ব্বক চলা-ফেরা করিলে আত্মসংযম বিশেষ আয়াস-সাধ্য ব্যাপার নহে। বস্তুতঃ এ-কথা কেবল আমি একাই বলিতেছি না, প্রাকৃতির উপায়ে যাঁহারা ব্যাধির আরোগ্য করেন, জার্ম্মানীর এবং অন্যান্য স্থানের এইরূপ আরও অনেকে এ-কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, জল-চিকিৎসা অথবা মাটির প্রলেপ এবং ফল-মূলাদি ও জ্বাল দিয়া সিদ্ধ করা হয় নাই এরূপ খাদ্য স্নায়ু-মণ্ডলকে শান্ত রাখে, ইন্দ্রিয়সমূহকে সহজে সংযত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক যন্ত্র-ব্যবস্থাকে সবল করে। রাজযোগীরা বলেন—উন্নততর যোগাভ্যাসের কথা বাদ দিলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাণায়ামের দ্বারা এই ফলই পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জগৎ বা প্রাচীন ভারতের এই সব পদ্ধতি সন্ন্যাসীদের জন্য পরিকল্পিত হয় নাই, প্রধানতঃ গৃহস্থদের জন্যই তাহা পরিকল্পিত হইয়াছিল। এ-কথা যদি কেহ বলেন যে, অতিরিক্ত জন-সংখ্যা কমাইবার জন্য জাতির পক্ষে জন্ম-নিরোধ প্রয়োজন, তবে সে-কথার আমি প্রতিবাদ করি। এ-সত্য প্রমাণিত হয় নাই। আমার মতে যোগ্যতর ভাবে জমির ব্যবহারের দ্বারা, কৃষির শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থার দ্বারা, অনুপূরক শিল্পের দ্বারা, আজ এদেশে যত লোক আছে তাহার দ্বিগুণ লোকের ভরণ-পোষণ চলিতে

পারে। আমি যে ভারতবর্ষের জন্ম-নিরোধের পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছি তাহার কারণ দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা।

আমার মত এই যে, বংশ-রক্ষার প্রয়োজন শেষ হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যাও বন্ধ করা দরকার। আত্মসংযমের উপায়গুলিকে কার্য্যকরী এবং জন-প্রিয় করিয়া তোলা অসম্ভব নহে। শিক্ষিত লোকেরা এ-সম্বন্ধে কোনোই চেষ্টা করেন নাই। ইহার কোনো চাপই তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সহ্য করেন নাই এবং সেজন্য যৌথ-পারিবারিক পদ্ধতিকেই ধন্যবাদ দিতে হয়। যাঁহারা চাপ সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারাও এই সমস্যার ভিতর যে নৈতিক ব্যাপার আছে সে সম্বন্ধে মাথা ঘামান না। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এখানে ওখানে দুই চারিটা বক্তৃতা দেওয়া ভিন্ন, সন্তানোৎপাদন কমাইবার সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া আত্মসংযমের পথকে প্রচার করিবার জন্য কোনো সুনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন হয় নাই। পক্ষান্তরে বরং বড় পরিবার যে ভালো জিনিষ এবং কাম্য-বস্তু —এই কুসংস্কারই এখন পর্য্যন্তও চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মোপদেষ্টারা সাধারণতঃ এ-শিক্ষা দেন না যে, সন্তানোৎপাদন করা কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় যেমন ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য, তেমনি আবার কোনো কোনো অবস্থায় সন্তানোৎপাদন না করাও ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য।

আমার আশঙ্কা হয়—জন্ম-নিরোধের পৃষ্ঠ-পোষকেরা এ-কথাটা ধরিয়াই লইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ জীবনের পক্ষে একটি প্রয়োজন এবং ইহা জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। নারী জাতির জন্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় তাহা সত্যই অত্যন্ত করুণ। কিন্তু কৃত্রিম-পদ্ধতির দ্বারা গর্ভ নিরোধের যুক্তি সমর্থনের জন্য যদি আমরা নারী জাতির উল্লেখ করি, আমার মনে হয়, তাহার দ্বারা তাহাদের অপমানই করা হয়। বর্ত্তমান অবস্থাতেই

পুরুষের কামাসক্তি নারীর যথেষ্ট অধঃপতন ঘটাইয়াছে। ইহার পরেও আবার যদি কৃত্রিম পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত হয়, তবে জন্ম-নিরোধের পৃষ্ঠ-পোষকদের ইচ্ছা যতই শুভ হোক্ না কেন, তাহার অধঃপতন আরও বাড়িয়া উঠিবে। আমি জানি—এরূপ আধুনিক মহিলাও আছেন যাঁহারা এই কৃত্রিম পদ্ধতি অনুমোদন করেন। কিন্তু এ-সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ নাই যে, অধিকাংশ রমণীই, তাঁহাদের আত্ম-সম্মান-বোধের সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া এ-সব পদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধা করেন না। পুরুষ যদি সত্য সত্যই তাঁহাদের শুভ চা'ন, তবে পুরুষের নিজেকেই সংযত করিতে হইবে। নারী পুরুষকে প্রলুব্ধ করে না। বাস্তবিক পক্ষে পুরুষই আক্রমণকারী, সেই জন্য সেই প্রকৃত অপরাধী এবং সেই তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দায়ী।

কৃত্রিম পদ্ধতির পৃষ্ঠ-পোষকদিগকে আমি উহার পরিণাম ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই পদ্ধতি-গুলি যদি বেশী ব্যবহৃত হইতে থাকে, তবে তাহার ফলে বিবাহের বন্ধন নষ্ট হইয়া যাইবে—সমাজে বন্ধনহীন স্বাধীন ভালোবাসার স্রোত বহিবে। পাশবিক প্রবৃত্তির অনু-প্রেরণাতেই যদি মানুষ পাশবিক প্রবৃত্তির পরিচর্য্যায় রত হয়, তবে তখন সে কি করিবে যখন দীর্ঘদিনের জন্য তাহাকে বিদেশে থাকিতে হইবে, অথবা সৈনিকের ব্রত লইয়া যখন তাহাকে কোনো দীর্ঘ যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, অথবা যখন সে বিপত্নীক হইবে, কিংবা তাহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য যখন এরূপ হইবে যে, কৃত্রিম পদ্ধতির অবলম্বন সত্ত্বেও তাহার স্বাস্থ্যের হানি না করিয়া তাহার সহিত সঙ্গম করা অসম্ভব ?

কিন্তু অন্য একজন পত্রলেখক লিখিতেছেন—"সম্প্রতি 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' জন্ম-নিরোধ সম্পর্কে আপনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে বলা

হইয়াছে—কৃত্রিম পদ্ধতির ব্যবহার হানিকর। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমি বলিতেছি যে, গোড়াতেই আপনি বিষয়টির সম্বন্ধে অবিচার করিয়াছেন। ১৯২২ সালে লণ্ডনে আন্তর্জ্জাতিক 'জন্ম-নিরোধ-কন্‌ফারেন্সের' অধিবেশন হয়! বৈঠকে কেবল চিকিৎসা-ব্যবসায়ী সদস্যেরাই যোগদান করিয়াছিলেন। এই বৈঠকে কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনার বিভাগে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। বৈঠকে ১৬৪ জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মাত্র তিনজন ইহার বিরুদ্ধে ভোট দেন। প্রস্তাবটি এইরূপ—'ডাক্তারদিগের দ্বারা গঠিত পঞ্চম 'আন্তর্জ্জাতিক জন্ম-নিরোধ-বৈঠকে'র এই সভা নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান-সম্মত কৃত্রিম পদ্ধতির দ্বারা জন্ম-নিরোধ করা দেহ, আইন এবং নীতি—এই তিন দিক হইতেই গর্ভপাত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। তাহা ছাড়া এ অভিমতও তাঁহারা প্রদান করিতেছেন যে, উৎকৃষ্ট কৃত্রিম পদ্ধতির প্রয়োগ স্বাস্থ্যের হানি করে, বা বন্ধ্যাত্ব আনিয়া দেয়, এরূপ কোনো প্রমাণও পাওয়া যায় নাই।'

"আমার মনে হয় চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্ নর-নারীর এই বিরাট সঙ্ঘ, যাহার সহিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠতম ডাক্তারের নামও সংযুক্ত আছে তাঁহাদের অভিমতকে কলমের এক খোঁচায় বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না। আপনি লিখিয়াছেন—কৃত্রিম পদ্ধতির ব্যবহারের দ্বারা নিশ্চয়ই ক্লীবত্ব এবং স্নায়বিক অক্ষমতা দেখা দেয়। 'নিশ্চয়' কেন? আমি বলিতে চাই—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের পরিণাম এরূপ হয় না। তবে অজ্ঞতার ফলে ক্ষতিকর পদ্ধতিগুলি যদি কেহ গ্রহণ করে তবে তাহা অবশ্যই হইতে পারে। যাহাদের কৃত্রিম পদ্ধতি অবলম্বনের

প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ যাহারা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম, ইহাও একটি কারণ যে জন্য বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিগুলি তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। আপনি এ-সব পদ্ধতিকে কৃত্রিম বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারদিগকে আত্ম-নিরোধের উপায় উদ্ভাবন করিতেও অনুরোধ করিয়াছেন। আপনার কথা আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিতেছি না। ডাক্তারদিগকেই যদি আত্ম-নিরোধের উপায় বাহির করিতে বলা হয়, তবে তাঁহারা যাহা আবিষ্কার করিবেন তাহা কি কৃত্রিম পদ্ধতিই হইবে না? আপনি বলিয়াছেন 'যৌন-সম্মিলনের উদ্দেশ্য আনন্দ নহে, তাহার উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন।' এ 'উদ্দেশ্য' কাহার উদ্দেশ্য?—ঈশ্বরের? তাহাই যদি হয় তবে তিনি যৌন-অনুভূতিই বা কেন সৃষ্টি করিলেন? আরও বলিয়াছেন—প্রকৃতি অত্যন্ত নির্ম্মম, এবং এইরূপ কোনো নিয়মের ব্যভিচারের জন্য সে সম্পূর্ণ প্রতিশোধই গ্রহণ করে।' কিন্তু ভগবানকে যেমন লোক বলিয়া কল্পনা করা হয়, আর যাহাই হোক্, প্রকৃতি সেরূপ কোনো জিনিষ নহে এবং সে কাহারো উপরে কোনো হুকুমও জারী করে না। প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করা অসম্ভব। প্রকৃতির রাজ্যে কাজের ফল অলঙ্ঘনীয়। ভালো বা মন্দ এ নাম আমরাই দিয়াছি। যাহারা কৃত্রিম পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারাও যেমন নিজেদের কৃতকর্ম্মের ফল গ্রহণ করে, যাহারা আশ্রয় লয় না তাহারাও তেমনি গ্রহণ করে তাহাদের কর্ম্মের ফল। একথা যদি আপনি প্রমাণ করিতে না পারেন যে, কৃত্রিম পদ্ধতির ব্যবহার অহিতকর, তবে আপনার যুক্তিরও কোনো অর্থ থাকে না। পর্য্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা আমার কাছে যাহা ধরা পড়িয়াছে তাহাতে

আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে কৃত্রিম পদ্ধতির ব্যবহার হানিকর নহে। কাজের ভিতরকার সুনীতি এবং দুর্নীতিকে তাহার ফলের দ্বারাই বিচার করিতে হইবে, আনুমানিক সংস্কারের উপর নীতির বিচার করা চলে না।

"আপনি যে উপায়ের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, মেলথাস্‌ও সেই উপদেশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা পালন করা আপনাদের মতো বাছাই করা জন-কত লোক ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেই অসম্ভব। যে সব উপায় কাজে লাগানো যাইবে না তাহার ওকালতী করিয়া লাভ কি? ব্রহ্মচর্য্যের উপকার অনেক বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান জগতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মহারথীরা—যাঁহাদের ধর্ম্ম-সম্পর্কীয় কুসংস্কার নাই—তাঁহারা মনে করেন, ২২ বৎসর অথবা ঐরূপ কোনো বয়সের পরে ব্রহ্মচর্য্য নিশ্চিত রূপেই অপকারী। ধর্ম্মের সম্পর্কে আপনার যে গোঁড়ামী আছে তাহারই ফলে আপনি মনে করিতেছেন যে, প্রজননের উদ্দেশ্য ছাড়া যৌন-সম্মিলন পাপ। ফলের কথা পূর্ব্বে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আপনি বলিতেছেন —হয় সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়চর্য্যা বন্ধ কর, নতুবা পাপে পড়িবার জন্য প্রস্তুত হও। মনস্তত্ত্ব এ-শিক্ষা দেয় না এবং দিনের আলোও এত বেশী যে, এখন আর কাহাকেও বিজ্ঞানকে অবহেলা করিয়া সংস্কারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইবার জন্য অনুরোধ করা চলে না।"

লেখক এমন একটা ভাব গ্রহণ করিয়াছেন যাহার সঙ্গে আপোষ চলে না। আমার বিশ্বাস, আমি এরূপ বহু উদাহরণ দিয়াছি যাহার দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অসংযম নহে আত্ম-সংযমই জীবন-যাত্রা পরিচালনার বিধান হওয়া সঙ্গত। আমি প্রশ্নটি ঘুরাইয়া

লইয়াও আলোচনা করি নাই—কারণ আমি এই কথাই বলিয়াছি যে, কৃত্রিম পদ্ধতি—তাহা যতই ভালো হোক্ না কেন, অত্যন্ত অপকারী। তাহার নিজের ধরণে তাহা অপকারী না-ও হইতে পারে, কিন্তু ভোগের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভোগের ক্ষুধা বাড়ায়, সুতরাং সে হিসাবে তাহা যে অপকারী তাহাতে তো সন্দেহই নাই। যে মন ইন্দ্রিয়াতিশয্যকে কেবল বিধি-গর্হিত নহে বলিয়াই মনে করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহা কাম্য বলিয়াও মনে করে, সে রকমের মন তো কেবল ইন্দ্রিয় ভোগেই রত থাকিবে এবং অবশেষে তাহা এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে যে, তাহার কোনো ইচ্ছাশক্তিও আর থাকিবে না। আমি মনে করি, অসংযমের প্রত্যেকটি কাজের দ্বারা সেই বহু মূল্য জীবনী-শক্তিরই ক্ষয় হয় যাহা নর-নারীকে দেহ, মন ও আত্মার দিক হইতে সুস্থ ও সবল রাখে। এখানে যদিও আমি এখন আত্মার উল্লেখ করিতেছি, আলোচনা হইতে ইতিপূর্ব্বে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বকই বাদ দিয়াছিলাম। কারণ আমি যে সব যুক্তি দিয়াছি তাহা আমার এই পত্র-লেখকেরা যে সব তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন তাহারই বিরুদ্ধে এবং আমার মনে হয় আত্মার অস্তিত্বকে ইঁহারা স্বীকার করেন না। অতি-বিবাহ এবং দুর্ব্বল স্নায়ুর লোকে ভরা এই ভারতবর্ষে কোনো শিক্ষার যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাহা কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্যে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার শিক্ষা নহে, তাহা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়-নিরোধের শিক্ষা। যে জীবনীশক্তি আমাদের নষ্ট হইয়াছে তাহা পুনরায় লাভ করিবার জন্যও অন্ততঃ এ শিক্ষা আবশ্যক। যে সব নীতি-বিগর্হিত ঔষধের বিজ্ঞাপন আমাদের মুদ্রাযন্ত্রকে কলঙ্কিত করিতেছে, জন্ম-নিরোধের পৃষ্ঠ-পোষকদের তাহা

হইতেই সতর্ক হওয়া দরকার। যাহা এ বিষয়ের আলোচনায় আমাকে বাধা দিয়াছে তাহা আমার ভণ্ডামীও নহে, রুচী-বাগীশতাও নহে। আমি নিশ্চিত রূপেই জানি যে, দেশের জীবনী-শক্তিহীন এবং দুর্ব্বল স্নায়ুর যুবকেরা, ইন্দ্রিয়াসক্তির পক্ষে যে সব আপাত-রম্য যুক্তি দেওয়া হয়, অতি সহজেই তাহার খপ্পরে পড়ে। এই জ্ঞানই এ-সম্বন্ধে আলোচনায় আমাকে বাধা দিয়াছে।

দ্বিতীয় পত্র-লেখক যে সব ডাক্তারি সার্টিফিকেটের ফিরিস্তি দাখিল করিয়াছেন, অতঃপর তাহার উত্তর দিবার আর সামান্যই প্রয়োজন আছে। আমার সম্পর্কে তাহা সম্পূর্ণরূপেই অপ্রাসঙ্গিক। উপযুক্ত কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহারের দ্বারা দেহের ক্ষতি হয়, অথবা তাহা বন্ধ্যাত্ব আনিয়া দেয়—এ-কথা আমি স্বীকারও করি না, অস্বীকারও করি না। নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াচর্য্যের ফলে আমি শত শত যুবককে ধ্বংস হইতে দেখিয়াছি। ডাক্তারের দল, তাঁহারা যত বড় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কই হউন না কেন, এই ধ্বংসকে নিন্দা না করিয়া পারেন না।

নকল দাঁতের সঙ্গে প্রথম পত্র-লেখক যে উপমা টানিয়াছেন তাহার প্রয়োগ সুষ্ঠু হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। নকল দাঁত যে কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক তাহা সত্য। কিন্তু তাহার দ্বারা একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য না খাইয়া জিহ্বার তৃপ্তির জন্য যখন খাওয়া হয়, তাহা যে ধরণের হয়, কৃত্রিম পদ্ধতিগুলি ঠিক সেই ধরণেরই ব্যাপার। ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার জন্যই যৌন-সঙ্গম করা যেমন পাপ, তৃপ্তির জন্য খাওয়াও তেমনি পাপ।

শেষোক্ত পত্রখানির ভিতরে যে সব তথ্য আছে তাহার পত্রখানি কৌতূহলোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে :—

"এই সমস্যাটি দুনিয়ার শাসন-তন্ত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে—আমি আপনার জন্ম-নিরোধ প্রবন্ধটির কথা বলিতেছি। আমেরিকান-গবর্ণমেণ্টের প্রজননের প্রতি সহানুভূতির অভাবের কথা আপনি অবশ্যই জানেন। আর একটি প্রাচ্য রাজ্য যে জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধে একেবারে খোলা হুকুম দিয়াছেন তাহার কথাও আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন—আমি জাপানের কথা বলিতেছি! একজন জন্ম-নিরোধকে কৃত্রিম পদ্ধতিতেই হোক্, আর অস্বাভাবিক উপায়েই হোক্—সম্পূর্ণ ভাবে বাগে রাখিয়াছে,—কেন তাহার কারণ সকলেই জানেন। আর একজন ইহার প্রতিভূ হইয়া আছেন—ইহার কারণও দুনিয়ার অজ্ঞাত নহে। আমার মতে জাপান-গবর্ণমেণ্ট সত্যের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনি কি মনে করেন না, সে জন্য তাহাদিগকে বাহাদুরী দিতে হয়? তাহাদের পক্ষে জন্মের হার কমানো একান্ত আবশ্যক, এবং সে জন্য তাহারা মনুষ্য-চরিত্রকে তাহার বর্ত্তমান মূল্য দিতেই বাধ্য। পাশ্চাত্য জগতে জন্ম-নিরোধ বলিতে বর্ত্তমানে যাহা বুঝায় তাহাই কি তাহার হাত হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ নহে? আপনি অবশ্য সজোরে বলিবেন "না"। কিন্তু আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহা অনুসরণ করা কি সম্ভব? তাহা আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করার কি সম্ভাবনা আছে? যথেষ্ট পরিমাণে যৌন-সম্মিলনের আনন্দ পরিহার করিয়া চলিবে—ইহা কি জন-সঙ্ঘের

নিকট হইতে আশা করা যায়? কয়েকজন অসাধারণ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে যাঁহাদের পক্ষে আত্মসংযম করা অথবা ব্রহ্মচর্য্য পালন করা কঠিন নহে। কিন্তু জন-সাধারণের ব্যাপারে এই সব পদ্ধতির দ্বারা সাফল্য লাভ সম্বন্ধে কি নিশ্চিত হওয়া যায়? ভারতবর্ষের এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য জনসাধারণের ভিতর আন্দোলনেরই যে প্রয়োজন!

আমেরিকা এবং জাপানের সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা আমি স্বীকার করিতেছি। জাপান কেন যে জন্ম-নিরোধের পৃষ্ঠ-পোষকতা করিতেছে তাহা আমি জানি না। লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা জন্ম-নিরোধ জাপানে যদি সাধারণ ব্যাপারের ভিতর আসিয়া পড়িয়া থাকে, তবে একথা আমি নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এই সুন্দর জাতিটি দ্রুত গতিতে নৈতিক ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

হয়তো আমি সম্পূর্ণ ভুল করিতেছি। হয়তো বা ভুল যুক্তির উপরেই আমার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যাঁহারা কৃত্রিম পদ্ধতির পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন তাঁহাদেরও ধৈর্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক। বর্ত্তমানের উদাহরণ ছাড়া তাঁহাদের হাতে আর কোনো প্রমাণ নাই। মানুষের নৈতিক জ্ঞানের কাছে যাহা বিরক্তিকর এমন পদ্ধতির সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সহিত কোনো নির্দ্দেশ দেওয়ার পক্ষে এ সময় অত্যন্ত অল্প। যৌবনের ধর্ম্মের সহিত খেলা করা খুব সহজ, কিন্তু এ-ধরণের খেলা যে-সব অন্যায়ের আমদানি করে তাহার প্রতিকার করা অত্যন্ত কঠিন।*

* ইয়ং ইণ্ডিয়ায় গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

শ্রেষ্ঠ পথ

ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। কতকগুলি বিষয় আছে, কখনো কখনো আমি 'নবজীবনে' যাহার আলোচনা করিলেও, বক্তৃতায় কদাচিৎ কিছু বলি। ব্রহ্মচর্য্য সেই সব বিষয়ের অন্যতম। এ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি কখনো বক্তৃতা করি নাই। কারণ আমি জানি, কথার দ্বারা ইহাকে বুঝানো যায় না, ইহা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। যে-সঙ্কীর্ণ অর্থে সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আপনারা আমাকে সেই সম্বন্ধেই বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সংযমের ভিতর দিয়া ইহার যে অধিকতর ব্যাপক অর্থ আছে সে-সম্বন্ধে বলিতে অনুরোধ করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহার পালনও শাস্ত্রে কঠিন কাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মোটের উপর ইহা সত্য। কিন্তু আমি আশা করি যে, আমি যদি অনুরূপ দুই একটি মন্তব্য করি, আপনারা আপত্তি করিবেন না। আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করি না বলিয়াই ব্রহ্মচর্য্য আমাদের কাছে কঠিন বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ স্বাদেন্দ্রিয়ের কথাই ধরা যাক্। এই ইন্দ্রিয়টিই আমাদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালিত করে। খাদ্যের বিলাস যে ত্যাগ করিয়াছে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা তাহার পক্ষে সহজ। পশু-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন —নিম্নতর শ্রেণীর প্রাণীরা (যেমন গবাদি প্রাণী) মানুষের অপেক্ষা বেশী ব্রহ্মচর্য্য পালন করে। এ-কথার ভিতর প্রচুর সত্য আছে। ইহার কারণ খাদ্য সম্বন্ধে এই সব প্রাণীর সম্পূর্ণ সংযম আছে, এ-সংযম

তাহাদের ইচ্ছা প্রসূত নহে—ইহা আমাদের স্বভাব-জাত। তাহারা কেবল শুষ্ক ঘাস ইত্যাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং তাহাও তাহাদের পরিপুষ্টির জন্য যতটা প্রয়োজন তাহার বেশী গ্রহণ করে না। তাহারা বাঁচিবার জন্যই আহার করে, আহার করিবার জন্যই বাঁচে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মা তাঁহার সন্তানকে নানা রকমের সুস্বাদু খাদ্যের দ্বারা আদর করেন। তাঁহারা মনে করেন—খাওয়াইলেই বুঝি ছেলেকে ভালোবাসা দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার দ্বারা পুত্রের খাদ্যের আনন্দকে বাড়ানো হয় না, সমস্ত জিনিষই তাহার কাছে বিস্বাদ ও বিরক্তিকর করিয়া তোলা হয়। স্বাদ ক্ষুধার উপরেই নির্ভর করে। একখানা শুষ্ক রুটি ক্ষুধার্ত্তের মুখে যেমন সুস্বাদু বলিয়া মনে হয়, যাহার ক্ষুধা নাই মিষ্টান্নও তাহার কাছে তেমন স্বাদ-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না। নানা রকম মশলা দিয়া আমরা নানাপ্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করি এবং তাহার দ্বারা উদর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলি এবং তাহার পর যখন দেখি যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন কঠিন, তখন তাহাতে বিস্মিত হই।

ভগবান আমাদিগকে যে চক্ষু দিয়াছেন তাহারও আমরা সদ্ব্যবহার করি না, যাহা সত্যই দেখার যোগ্য সে-সব জিনিষ দেখি না। মা কেন গায়িত্রী শিখিবেন না এবং ছেলেকেও তাহা শিখাইবেন না? মন্ত্রের ভিতরের সুগভীর অর্থ লইয়া তাঁহার মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নাই। ইহার দ্বারা সূর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হইয়াছে—ইহাই যদি তিনি বোঝেন ও ছেলেকে বুঝাইতে পারেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। মন্ত্রটির একটি অত্যন্ত স্থূল অর্থ আমি আপনাদের সামনে

উপস্থিত করিতেছি। সূর্য্যকে আমরা কেমন করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব?—সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া—চোখ দিয়া তাহার তর্পণ করিয়া। গায়ত্রী মন্ত্রের রচয়িতা ঋষি ছিলেন। তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—সূর্য্যোদয়ের সময় প্রত্যহ যে-অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়, তেমন অভিনব দৃশ্য আমরা আর কোথাও দেখিতে পাইব না। ভগবানের অপেক্ষা রঙ্গমঞ্চের বড় পরিচালক আর কেহ নাই এবং আকাশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চও পাওয়া যায় না। কিন্তু সে মা কোথায় যিনি পুত্রের চোখ ধুইয়া পবিত্র করিয়া দিবেন এবং আকাশের এই দৃশ্য দেখিতে বলিবেন? দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের জননীরা অন্য জিনিষ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন। বালক হয়তো বড় রাজ-কর্ম্মচারী হ'ন, সেজন্য তাহার স্কুলের শিক্ষাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কিন্তু গৃহের আবহাওয়ায় শিক্ষার যে-অংশ নির্ভর করে, আমাদের দ্বারা তাহার বেশীর ভাগই উপেক্ষিত হয়। পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানকে ভারি বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন এবং এইরূপে তাহাদের শ্বাস-রোধের ব্যবস্থা করিয়া মনে করেন, তাহাদের সৌন্দর্য্য বাড়ানো হইতেছে। শরীরটাকে কেবল ঢাকিবার জন্যই বস্ত্রের প্রয়োজন। তাপ এবং ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করাই বস্ত্রের উদ্দেশ্য, দেহের সৌন্দর্য্য বাড়ানো তাহার উদ্দেশ্য নহে। যদি শিশু শীতে কাঁপিতে থাকে, তবে তাহাকে আগুনের কাছে গা গরম করিবার জন্য পাঠাইয়া দিতে হইবে, অথবা তাহাকে পাঠাইয়া দিতে হইবে রাস্তায় দৌড়াইবার জন্য বা মাঠে কাজ করিবার জন্য। এইরূপেই তাহার স্বাস্থ্য সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলার সাহায্য করিতে পারা যায়। ছেলেকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া আমরা

তাহাকে একটা মিথ্যা উষ্ণতা দান করি। শরীরকে ঢাকার ব্যবস্থা করিয়া, উহাকে ধ্বংস করারই সাহায্য করা হয়।

আমাদের ঘরে ঘরে যেরূপ লঘু কথা-বার্ত্তা চলে তাহাও শিশুদের মনে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাবের সৃষ্টি করে। বয়োজ্যেষ্ঠরা তাহার বিবাহের কথা বলেন। চারদিকে যে-সব জিনিস সে দেখে তাহার ভিতরেও তাহাকে বিপথে লইয়া যাইবার উপাদান আছে। আমরা যে-বর্ব্বরতার সর্ব্বনিম্ন ধাপে নামিয়া দাঁড়াই নাই তাহাই বিস্ময়কর। যে-সব অবস্থায় সংযম অসম্ভব, সে-সব অবস্থার ভিতর থাকিয়াও সংযম রক্ষিত হইতেছে। ভগবানই এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে, মানুষ তাহার দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও বাঁচিয়া যাইতেছে। ব্রহ্মচর্য্যের পথ হইতে এই সকল বাধা যদি সরাইয়া দেওয়া হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য পালন কেবল সম্ভব নয়, তাহা ঢের সহজও হইয়া পড়ে।

আমরা এইরূপে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। তবু আমাদের চেয়ে শারীরিক শক্তিতে যাহারা শক্তিমান আমাদিগকে তাহাদের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। ইহার দুইটি পথ আছে। একটি দেবতার পথ, আর একটি শয়তানের পথ। ভালো মন্দ বিচার না করিয়া শরীর ভালো করিবার যে কোনো উপায় অবলম্বন করা এই শয়তানী পথেরই অন্তর্গত—উদাহরণ স্বরূপ গো-মাংস ভক্ষণ ইত্যাদির কথা বলা যায়। বাল্যকালে আমার একজন বন্ধু বলিতেন—'দেশের উন্নতির জন্য মাংস আমাদিগকে খাইতেই হইবে, নতুবা ইংরাজদের সঙ্গে আমরা সমান তালে চলিতে পারিব না। অন্যান্য জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যখন আসিয়া দাঁড়াইতে হইল তখনই জাপানে গো-মাংস ভক্ষণের

ব্যবস্থা সুরু হইল। শয়তানের পথ অবলম্বন করিয়া আমরা যদি দেহ গঠন করিতে চাই তবে জাপানের পথই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে।

কিন্তু সৎপথে অনুসরণের দ্বারা যদি শরীর তৈরী করিতে হয়, তবে ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। লোকে যখন আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে, তখন আমার নিজের উপর অনুকম্পা হয়। যাহারা আমার মতো বিবাহিত, যাহার সন্তান-সন্ততি আছে তাহাকে এ-আখ্যা কেমন করিয়া দেওয়া যায়? নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আমার মতো জ্বর, মাথাধরা, সর্দ্দি-কাশি, এপেণ্ডিসাইটিস্ প্রভৃতি ব্যারামে ভোগে না।

ডাক্তারেরা বলেন—পাকস্থলীতে যদি কমলা লেবুর বীজও থাকে তাহা হইলেও এপেণ্ডিসাইটিস্ হইতে পারে। কিন্তু পরিষ্কার সুস্থ শরীরে কমলালেবুর বীজটিও তো স্থায়ী স্থান লাভ করিতে পারে না। পাকস্থলী যখন দুর্ব্বল হয় তখনই সে আর বিদেশী বস্তু ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতে পারে না। আমার পাকস্থলীও নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়াছিল। তাই এপেণ্ডিসাইটিসের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। শিশুরা নানা রকমের জিনিষ আহার করে, মা সব সময় তাহাদিগকে চোখে রাখিতে পারে না। তবু যে তাহারা এ-রোগে ভোগে না তাহার কারণ, তাহাদের পাকস্থলীর কাজ অত্যন্ত জোরে চলে। সুতরাং কেহ যেন আমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া ভুল না করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অপরিসীম কঠিন উপাদানে গঠিত। আমি আদর্শ ব্রহ্মচারী নহি—যদিও আদর্শ ব্রহ্মচারী হইবার দুরাশা আমার আছে।

ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ইহা নয় যে, কোনো অবস্থাতেই ব্রহ্মচারী নারীকে, এমন কি তাহার নিজের ভগ্নীকেও স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহার অর্থ এই যে, সে যখন কোনও নারীকে স্পর্শ করিবে তাহার মনের অবস্থা এমন স্থির অচঞ্চল থাকিবে যে, সে যেন এক খণ্ড কাগজকেই স্পর্শ করিতেছে। ভগ্নীর পীড়ার সময় সেবায় যদি ইতস্ততঃ আসে সে ব্রহ্মচর্য্যের কোনোই মূল্য নাই। দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সংস্পর্শে আসিয়াও ব্রহ্মচারী তেমনি নির্ব্বিকারে থাকিবেন, একটি মৃত দেহের সংস্পর্শে আসিলে মানুষ যেমন নির্ব্বিকার থাকে। আপনারা যদি আপনাদের সন্তান-সন্ততির জন্য সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য চা'ন, তবে তাহাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতির অনুশাসন গড়ার ভার আপনাদের হাতে রাখিলে চলিবে না, সে-ভার ছাড়িয়া দিতে হইবে আমার মতোই ব্রহ্মচারীর হাতে—যদিও ত্রুটি আমার প্রচুরই আছে।

ব্রহ্মচারী স্বভাবতঃই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসের অপেক্ষাও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ইহাকে বিকৃত করিয়াছি। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রম এবং সঙ্গে সঙ্গে বানপ্রস্থাশ্রমও অধঃপতিত হইয়াছে। আর তাহারই ফলে সন্ন্যাসও অন্তর্হিত হইয়াছে। আমাদের অবস্থা এমনই শোচনীয়!

যদি আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত শয়তানের পথ গ্রহণ করি, তবে আমরা ৫০০ বৎসরেও পাঠানের সামনাসামনি দাঁড়াইতে সক্ষম হইব না। কিন্তু যদি দৈব পথটির অনুসরণ করা যায়, তবে আজই আমরা তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারি। কারণ এই পথ অনুসরণের জন্য যে-মানসিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা এই মুহূর্ত্তেই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দেহকে

ঐ ভাবে গড়িতে হইলে বহু যুগের আবশ্যক। ভগবানের ইচ্ছায় পিতা-মাতা যদি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, তবেই জাতি দৈব-পন্থা অনুসরণ করিবার শক্তি লাভ করিতে পারিবে।*

* ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে অনুদিত।

ব্রহ্মচর্য্য

এই বিষয়ে কিছু লেখা খুব সহজ নহে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা বেশ ব্যাপকই বলা যায়। সুতরাং তাহার ফল কিছু কিছু পাঠকদিগকে জানাইবার ইচ্ছা আমার সর্ব্বদাই আছে। আমি কয়েকখানা পত্র পাইয়াছি—পত্রগুলি আমার এই ইচ্ছাকেই দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে।

একজন পত্র-লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"ব্রহ্মচর্য্য কি? ইহা কি সম্পূর্ণভাবে পালন করা যায়? যদি পালন করা যায়, তবে আপনি কি সেই পূর্ণতার অবস্থা লাভ করিয়াছেন?"

ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বাস্তবিকভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে যাহা বুঝায় তাহা হইতেছে ব্রহ্মের অন্বেষণ। ব্রহ্ম সকলের ভিতরেই বাস করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে ধ্যানের দ্বারা এবং তাহার আনুসঙ্গিক তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা। ইন্দ্রিয়সমূহের উপর সম্পূর্ণ অধিকার না আসিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। সেই-জন্য ব্রহ্মচর্য্য বলিতে সমস্ত সময়ে, সমস্ত স্থানে চিন্তা বাক্য এবং কাজে ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করার শক্তিই বুঝায়।

যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এরূপ নর, অথবা নারী সম্পূর্ণ রূপেই নিষ্পাপ হয়। সুতরাং তাঁহারা ভগবানের অতি কাছে—তাঁহারা প্রায় ভগবানের মতোই।

ব্রহ্মচর্য্যে এইরূপ পূর্ণতা লাভ করা যে সম্ভব তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের সঙ্গেই বলিতেছি যে, আমি এই পরিপূর্ণতা লাভ

করি নাই, যদিও এ-দিক দিয়া আমার চেষ্টারও অন্ত নাই। বস্তুতঃ এই জীবনেই তাহা লাভ করিবার আশা আমি এখনও ছাড়িতে পারি নাই।

জাগ্রত অবস্থায় সব সময় আমি সতর্ক আছি। দেহকে আমি জয় করিতে সক্ষম হইয়াছি, বাক্যকেও সংযত করিয়াছি। কিন্তু চিন্তা সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে আমি যখন আমার চিন্তা-ধারা নিয়োগ করিতে চাই, অন্য চিন্তা আসিয়া বিঘ্ন ঘটায়, উভয় চিন্তার ভিতর বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু তবু জাগ্রত মুহূর্ত্তে এই সংঘর্ষও আমি এড়াইয়া চলিতে পারি। এ-কথা বলিতে পারা যায় যে, আমি সেই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যখন আমার মন অসৎ চিন্তার প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঘুমের ভিতর চিন্তার এই সংযম আমি এখনও লাভ করিতে পারি নাই। নিদ্রায় নানা রকমের চিন্তা আমার মনের ভিতর প্রবেশ করে, এবং অপ্রত্যাশিত স্বপ্নের অবির্ভাব হয়। কখনো কখনো সেই সব সুখেচ্ছার উদ্রেক হয় যাহা আমি পূর্ব্বে ভোগ করিয়াছি। যখন এই সব ইচ্ছা অপবিত্র হয়, তখনই তাহা খারাপ স্বপ্ন। এই অবস্থা পাপ-পূর্ণ জীবনেরই পরিচয় দেয়।

আমার পাপের চিন্তা আহত হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় নাই। চিন্তার উপর যদি আমি সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জ্জন করিতে পারিতাম, তবে প্লুরিসি, আমাশয়, এপেণ্ডিসাইটিস্ প্রভৃতি ব্যাধি যাহাতে আমি গত দশ বৎসর ভুগিয়াছি, তাহার প্রকোপ আমাকে সহ্য করিতে হইত না! আমি বিশ্বাস করি—আত্মা যখন নিষ্পাপ হয়, যে

দেহে সে বাস করে তাহাও সুস্থ হয়। অর্থাৎ আত্মা যেমন পাপ হইতে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, দেহও তেমনি ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সুস্থ শরীরের অর্থ বলবান দেহ নহে। আত্মা যেমন বল লাভ করিতে থাকে, দেহ তেমনি ক্ষীণ হইতে থাকে। সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরও যথেষ্ট পরিমাণে কৃশ হইতে পারে। সবল দেহেই প্রায় রোগ থাকিতে দেখা যায় এবং যদি রোগ না-ও থাকে, এরূপ দেহ রোগের দ্বারা সহজেই সংক্রামিত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ যে দেহ, রোগের দ্বারা তাহা একেবারেই আক্রান্ত হইতে পারে না। পবিত্র রক্তের রোগ-বীজাণু প্রতিরোধের শক্তি আছে।

এই আশ্চর্য্য অবস্থায় পৌছানো বাস্তবিকই খুব কঠিন। তাহা না হইলে আমি সে অবস্থায় পৌছিতে পারিতাম। কারণ, এ-সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ যে, সেই অবস্থায় পৌছিবার জন্য যতগুলি উপায় আছে তাহার একটিকেও আমি উপেক্ষা করি নাই। বাহ্যিক এমন কোনো বস্তু নাই যাহা লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে আমাকে বাধা দিতে পারে। কিন্তু অতীতের কাজ আমাদের উপর যে রেখাপাত করিয়া যায় তাহা মুছিয়া ফেলা সহজ নহে। তবু এই বিলম্বের জন্য আমি হতাশ হই নাই। কারণ আমি পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভের অবস্থা কল্পনা করিতে পারি এবং ইহার ক্ষীণ আভাস আমার কাছে ধরাও পড়ে। এ-দিক দিয়া আমি যতটা অগ্রসর হইয়াছি তাহা আশাই দেয়, হতাশা আনয়ন করে না। এমন কি আশা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি আমি মারাও যাই তথাপি আমি এ-কথা মনে করিব না যে, আমি পরাজিত হইয়াছি। কারণ বর্ত্তমান জীবনের উপর আমার যেরূপ বিশ্বাস আছে, ভবিষ্যৎ জীবনের উপরেও আমার

তেমনি গভীর বিশ্বাস রহিয়াছে এবং সেই জন্য আমি জানি, এ-দিক দিয়া সামান্য এতটুকু চেষ্টাও ব্যর্থ হইবে না।

ব্যক্তিগত জীবনের এত যে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতেছি তাহার কারণ, আমার পত্র-লেখকেরা এবং অন্যান্য সকলে ইহা হইতে অনুরূপ অবস্থায় উৎসাহ লাভ করিতে পারিবেন। প্রত্যেকের ভিতরে একই আত্মা বাস করিতেছে। সমস্ত আত্মা একই রকমের শক্তির অধিকারী। কেবল কেহ কেহ অনুশীলন করিয়া এই শক্তি বাড়াইয়াছেন এবং কাহারো কাহারো ভিতর তাহা সুপ্ত অবস্থাতে আছে। যাহারা শেষোক্ত দলভুক্ত, চেষ্টা করিলে তাঁহারাও এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন।

এ-পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাপক অর্থেই আমি তাহার আলোচনা করিয়াছি। চলিত অর্থে ব্রহ্মচর্য্য বলিতে বুঝায় চিন্তা, বাক্য এবং কাজে কাম-প্রবৃত্তির সংযম। এ-অর্থের ভিতরেও সত্য আছে। কারণ ইন্দ্রিয়-সংযম অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। স্বাদেন্দ্রিয়ের সংযমের উপর সমানভাবে জোর দেওয়া হয় না এবং সেই জন্যই কাম-প্রবৃত্তির সংযম অধিকতর কঠিন, এমন কি তাহা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হইয়াই দাঁড়ায়। ডাক্তারেরা বলেন, যে-দেহ ব্যাধিতে জীর্ণ, কামের প্রভাব সেই দেহেই বেশী। সেই জন্য দুর্ব্বল লোকদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন কঠিন বলিয়া মনে হয়।

উপরে আমি দুর্ব্বল কিন্তু সুস্থ দেহের উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইতেই যেন কেহ মনে না করেন যে, আমাদের দৈহিক উৎকর্ষ লাভের ব্যবস্থা উপেক্ষা করিতে হইবে। আমার অক্ষম ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরণের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি। সুতরাং সে ব্যাখ্যা ভুল বুঝিবার আশঙ্কাও আছে। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ ভাবে জয় করিতে চা'ন,

তাঁহাকে দৈহিক দুর্ব্বলতা বরণ করিবার জন্যও প্রস্তুত হইতে হইবে। দেহের প্রতি যখন সমস্ত আসক্তি দূর হয়, তখন দেহের শক্তি বাড়াইবার ইচ্ছাও অন্তর্হিত হয়।

কিন্তু যে ব্রহ্মচারী কাম-প্রবৃত্তিকে জয় করিয়াছে তাহার দেহ অত্যন্ত দৃঢ় এবং দীপ্তিপূর্ণ হইবে। এই সীমাবদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যও একটি অপূর্ব্ব বস্তু। স্বপ্নেও যাঁহার কাছে কাম-প্রবৃত্তি ঘেঁষিতে পারে না, তিনি জগতের সম্মানার্হ। এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে, তাঁহার পক্ষে অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে জয় করা সহজ।

অন্য একটি বন্ধু লিখিয়াছেন—"আমার অবস্থা অনুকম্পার যোগ্য। দিনে-রাতে, আফিসে রাস্তায়, যখন পড়ি অথবা কাজ করি, এমন কি যখন উপাসনা করি তখনও আমার মন পাপ চিন্তার দ্বারা অশান্ত হইয়া উঠে। এই চিন্তাকে আমি কি উপায়ে সংযত করিব? নারী জাতিকে নিজের মা বলিয়া মনে করিবার উপায় কি? আমার চোখ হইতে পবিত্র স্নেহ ভিন্ন আর কিছু যাহাতে নির্গত না হয় তাহার উপায় কি? অসৎ চিন্তা আমি কি করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারিব? আপনার ব্রহ্মচর্য্য শীর্ষক প্রবন্ধটি আমার সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু মনে হয় না, তাহার দ্বারা আমি কিছুমাত্র লাভবান হইতে পারিব।"

এ-বর্ণনা সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। আমাদের অনেকের অবস্থাই এইরূপ সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু যতক্ষণ অসৎ চিন্তার বিরুদ্ধে মন জাগ্রত থাকে ততক্ষণ নিরাশ হইবার কারণ নাই। চোখ এবং কাণ যদি পাপ করিতে থাকে, তবে চোখকে ঢাকিতে হইবে, কাণকে তুলার দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে। দৃষ্টিকে নানা দিকে ভ্রমণ করিবার অবকাশ না দিয়া, চোখ মাটির দিকে নামাইয়া রাখিয়া

ভ্রমণ করার অভ্যাস ভালো। যেখানে অমার্জ্জিত কথা বলা হয় এবং অশ্লীল গান গীত হয়, সেখান হইতে পলাইয়া যাওয়াই সঙ্গত।

স্বাদেন্দ্রিয়ের সংযম অর্জ্জন করিতে হইবে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, স্বাদেন্দ্রিয়কে যে জয় করিতে পারে নাই, কাম-প্রবৃত্তির জয় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। খাদ্যের বিলাস ত্যাগ করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু খাদ্যের বিলাস জয়ের সঙ্গে কাম রিপু জয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। স্বাদেন্দ্রিয়কে সংযত করিবার একটি উপায় হইতেছে সম্পূর্ণভাবে যতদুর সম্ভব মশলা ও চাটনি পরিহার করা। আর একটি উপায় হইতেছে—সর্ব্বদা এই ভাব পোষণ করা যে, আমরা কেবল দেহ-রক্ষার জন্যই আহার করি, স্বাদের জন্য আহার করি না। এই উপায়টিই অধিকতর কার্য্যকরী। বাতাস আমরা আস্বাদের জন্য গ্রহণ করি না, প্রাণ-ধারণের জন্য গ্রহণ করি। জলপান করি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। ঠিক সেই ভাবেই ক্ষুধাকে তৃপ্ত করিবার জন্যই আমাদিগকে খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা আমাদিগকে ঠিক বিপরীত অভ্যাসে অভ্যস্ত করিয়া তুলেন। বাঁচাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে নহে, ভ্রান্ত স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নানা রকমের রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য দিয়া আমাদিগকে বিপথগামী করেন। গৃহের এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে।

কিন্তু আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান সহায় হইতেছে 'রাম নাম' অথবা অনুরূপ কোনো মন্ত্র। 'দ্বাদশ মন্ত্রও' আবৃত্তি করা যাইতে পারে। আমি 'রাম নামের' উল্লেখ করিয়াছি, কারণ বাল্যকাল হইতে আমি ইহাতে অভ্যস্ত এবং যুদ্ধের সময় সর্ব্বদাই এই মন্ত্রই আমাকে সাহায্য করিয়াছে। যে মন্ত্রই গ্রহণ

করা যাক্ না কেন, তাহাতে একেবারে তন্ময় হইতে হইবে। জপের সময় যদি অন্য কোনো চিন্তা আসিয়া উপদ্রব করে, তবু তাহাতে শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। এ-সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহই নাই যে, যদি কেহ বিশ্বাসের সহিত জপ করিতে থাকে, পরিণামে তাহার জয় হইবেই। মন্ত্র যখন জীবনের অবলম্বন স্বরূপ হয়, তখন তাহাই সমস্ত বিপদের ভিতর দিয়া মানুষকে তরাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ পবিত্র মন্ত্র হইতে কেহ যেন পার্থিব লাভের আশা না করেন। ব্যক্তিগত পবিত্রতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ভিতর দিয়াই এই সব মন্ত্রের প্রকৃতিগত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিষ্ঠাবান অনুসন্ধিৎসু সঙ্গে সঙ্গেই এ-সত্য অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, তোতাপাখীর মত মন্ত্রোচ্চারণের কোনোই সার্থকতা নাই। মন্ত্রের ভিতর আত্মা অর্পণ করা আবশ্যক। তোতাপাখী যন্ত্রবৎ মন্ত্রোচ্চারণ করে, কিন্তু আমাদিগকে জ্ঞানের সহিত তাহার আবৃত্তি করিতে হইবে, এই আশা লইয়া আবৃত্তি করিতে হইবে যে, তাহা আমাদের মনকে অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত করিবে। সে-শক্তি যে মন্ত্রের আছে সে-সম্বন্ধেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা দরকার।*

*ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে অনুদিত।

সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য

একজন বন্ধু মহাদেব দেশাইকে লিখিয়াছেন—

"কিছুদিন পূর্ব্বে 'নবজীবনে' 'ব্রহ্মচর্য্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' সেই প্রবন্ধটি আপনি ইংরাজীতে তর্জ্জমা করেন। হয় তো আপনার স্মরণ আছে—এই প্রবন্ধে গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি এখনও খারাপ স্বপ্ন দেখেন। যে মুহূর্ত্তে আমি কথাটি পড়ি তখনই আমার মনে হইয়াছিল, এরূপ স্বীকারোক্তিতে কোনো লাভ নাই এবং পরে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার আশঙ্কাই ঠিক।

"যখন আমরা ইংলণ্ডে ছিলাম, আমি এবং আমার বন্ধুগণ প্রলোভন সত্ত্বেও আমাদের চরিত্রকে অম্লান রাখিয়াছিলাম। মদ, নারী এবং মাংস আমরা স্পর্শও করি নাই। কিন্তু গান্ধীজীর প্রবন্ধ পড়িয়াই বন্ধুদের ভিতর হইতে একজন হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন—'অমানুষিক সাধনার পরেও গান্ধীজীরই যদি এইরূপ অবস্থা হয়, তবে আমরা কোথায়? ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা অনর্থক। গান্ধীজীর স্বীকারোক্তি আমার মতকে সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিয়াছে। আজ হইতে আমাকে তোমরা হারাইয়াছ বলিয়া মনে করিও।' কতকটা দ্বিধার সঙ্গেই আমি তাহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলাম। বলিলাম—'পথ যদি গান্ধীজীর মতো লোকের পক্ষেও এত কঠিন হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে আরও কঠিন। সেইজন্যই আমাদের চেষ্টা আরও দ্বিগুণ বাড়ানো দরকার।' এই ধরণের যুক্তিই গান্ধীজী এবং আপনি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু যুক্তি-তর্ক বৃথা হইল। যে চরিত্র এতদিন

নিষ্কলঙ্ক ছিল তাহা ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। এই অধঃপতনের জন্ত কেহ যদি গান্ধীজীকে দায়ী করে, তবে গান্ধীজী এবং আপনি তাহার উত্তরে কি বলিবেন ?

"যতদিন এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তই আমার সম্মুখে ছিল ততদিন এ-সম্বন্ধে আমি কিছু আপনাকে লিখি নাই। লিখিলে হয়তো আপনারা এই বলিয়াই আমাকে জবাব দিতেন যে, এ একটা ব্যতিক্রম। কিন্তু এরূপ আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটিয়াছে এবং আমার আশঙ্কা যে সত্য তাহার প্রমাণ আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাইয়াছি

"আমি জানি, কতকগুলি বিষয়ে সাফল্য লাভ করা গান্ধীজীর পক্ষে অত্যন্ত সহজ এবং আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে আবার এমন কতকগুলি ব্যাপারও আছে যাহাতে সাফল্য লাভ করা গান্ধীজীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও আমার পক্ষে অসম্ভব না-ও হইতে পারে। এই অনুভূতি অথবা গর্ব্বই অধঃপতন হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে, যদিও উপরোক্ত স্বীকারোক্তি আমার নিরাপদ থাকার অনুভূতিকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

"এই ব্যাপারটির প্রতি আপনি অনুগ্রহ করিয়া গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন কি ? গান্ধীজী এক্ষণে আত্মজীবন চরিত লিখিতেছেন। সেই জন্যই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া আরও বিশেষভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। সত্য—নগ্ন সত্য বলা যে অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং 'নবজীবনের' পাঠকদের তাহা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমার ভয় হয়—একজনের মাংস অন্যের পক্ষে বিষ হওয়া অসম্ভব নয়।"

এ অভিযোগ আমার কাছে আকস্মিক কোনো ব্যাপার নহে। যখন অসহযোগ পুরা জোরে চলিতেছিল সেই যুদ্ধের সময়েই বিচারের একটি ভুলের কথা স্বীকার করিতে দেখিয়া একজন বন্ধু সরল ভাবেই আমাকে লিখিয়াছিলেন—'ইহা যদি ভুলই হয়, তবু তাহা স্বীকার করা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। জন-সাধারণের মনে এ বিশ্বাস জন্মানো দরকার যে, একজন লোক অন্ততঃ আছেন যিনি সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির অতীত। লোকে আপনাকে এইরূপই মনে করিত। আপনার স্বীকারোক্তি তাহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিয়াছে।' এ মন্তব্য এক দিকে আমাকে যেমন হাসাইয়াছে, অন্য দিকে আবার তেমনি দুঃখও দিয়াছে। হাসিয়াছি পত্র-লেখকের সরলতা দেখিয়া, কিন্তু একজন ভ্রান্ত লোককে অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার এই যে আকাঙ্ক্ষা—ইহা এমন একটি ব্যাপার যাহা সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন।

যে মানুষ যেমন, তাহাকে সেইরূপে জানাতেই মানুষের কল্যাণ। ইহার দ্বারা ক্ষতি হইতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমার ভুলের স্বীকারের দ্বারা শুভই হইয়াছে। আমার নিজের পক্ষে তো উহা ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে করি।

দুঃস্বপ্নের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিব। নির্দ্দোষ ব্রহ্মচারী না হইয়াও যদি আমি সেই অধিকারের দাবী করি, তবে তাহার দ্বারা জগতের প্রভূত অপকার হইবে। কারণ, তাহা ব্রহ্মচর্য্যকে ম্লান করিবে, সত্যের দীপ্তিকে নিষ্প্রভ করিবে। মিথ্যার দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যকে কলঙ্কিত করিবার অধিকার আমার কোথায়? আজ আমি দেখিতে পাইতেছি, ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আমি যে সব উপায়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা

যথেষ্টও নহে, এবং তাহার ফলও অব্যর্থ নহে। ইহার কারণ, আমি নির্দ্দোষ ব্রহ্মচারী নহি। ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রকৃষ্ট পথের নির্দ্দেশ দিতে না পারা সত্ত্বেও যদি দুনিয়াকে বিশ্বাস করিতে দেওয়া হয় যে, আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তবে তাহা একান্তই ভয়াবহ ব্যাপার হইবে।

পৃথিবীকে যদি জানিতে দেওয়া হয় যে, আমি একজন অকৃত্রিম অনুসন্ধিৎসু, আমার মন চির জাগ্রত আছে, এবং আমি নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছি, তবে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে না করিবার কারণ কি? অন্যে ইহা হইতে প্রচুর উৎসাহই বা লাভ না করিবে কেন? ভুল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ধারণা হইতে কোনো সিদ্ধান্ত করা অন্যায়। যে ফল লাভ করা গিয়াছে তাহা হইতেই সিদ্ধান্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ। আমার মতো লোকও নোংরা স্বপ্নের হাত হইতে মুক্ত নহে, সুতরাং আর কাহারও পক্ষে আশা নাই—এরূপ তর্কের সার্থকতা কি? 'এ ভাবেই কেন বা যুক্তি করা হইবে না যে, যে গান্ধী একদিন ইন্দ্রিয় সেবায় ডুবিয়াছিল সেও আজ তাহার স্ত্রীর সঙ্গে ভাই এবং বন্ধুর ন্যায় বাস করে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীকেও সে আজ কন্যা বা ভগ্নীর মত মনে করে—সুতরাং হীনবল লোকের পক্ষে, অধঃপতিত লোকের পক্ষেও আশা আছে। অত বড় একজন কামুক লোককেও যদি ভগবান কৃপা করিয়া থাকেন তবে অন্য সকলেও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবে।

পত্র-লেখকের বন্ধুগণ যাঁহারা ত্রুটি-বিচ্যুতির সংবাদ হইতেই পথভ্রষ্ট হইয়াছেন, সাম্‌নের দিকে তাঁহারা এক পাও অগ্রসর হ'ন নাই। তাঁহাদের মধ্যে যে মিথ্যা ধর্ম্মের বড়াই ছিল, প্রথম আঘাতে তাহাই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের পালন এবং অনুরূপ অভ্রান্ত নীতি সমূহের

প্রতিষ্ঠা আমার মতো দোষ-প্রমাদ পূর্ণ লোকের উপরে নির্ভর করে না। যাঁহারা এই সকলের জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং পরিপূর্ণভাবে এই সমস্তর ভিতরেই বাস করিয়াছেন তাঁহাদেরই প্রায়শ্চিত্ত যে ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছে —এ সব ধর্ম্মের নির্ভর তাহাই। এই সব পরিপূর্ণ মানবের পাশাপাশি দাঁড়াইবার সামর্থ্য যখন আমি লাভ করিব, তখন আমার ভাষায় আজ যে জোর আছে, তাহা অপেক্ষা ঢের জোর দেখা দিবে। যাহার চিন্তা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় না বা অন্যায়ের কল্পনা করে না, যাহার নিদ্রা স্বপ্নশূন্য, এবং ঘুমের মধ্যেও যিনি সদা জাগ্রত তিনিই প্রকৃত স্বাস্থ্যবান। কুইনাইন খাইবার তাঁহার প্রয়োজন হয় না। তাঁহার পরিশুদ্ধ রক্তের ভিতরেই সে শক্তি আছে যাহা সর্ব্বকার রোগবীজাণুর ছোঁয়াচকে বর্জ্জন করিয়া চলিতে পারে। দেহে, মনে এবং আত্মায় এই পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্যই আমি চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টা পরাজয়ও জানে না, ব্যর্থতাকেও ভয় করে না। পত্র-লেখককে, তাঁহার স্বল্প-বিশ্বাসী বন্ধুদিগকে এবং অন্যান্য সকলকেই আমি আমার এই যুদ্ধে যোগদান করিতে অহ্বান করিতেছি এবং আমি আশা করি, পত্র-লেখকের মতো তাঁহারাও আমার অপেক্ষা দ্রুত গতিতে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেন। যাঁহারা আমার পিছনে পড়িয়া আছেন আমার দৃষ্টান্ত হইতেই তাঁহারা অনুপ্রেরণা লাভ করুন। দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, রিপুর তাড়না সত্ত্বেও আমি যে সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহার কারণ আমার যুদ্ধ ছিল অবিশ্রাম এবং ভগবানের অনুগ্রহের উপর ছিল আমার অসীম বিশ্বাস।

সুতরাং কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই। আমার মহাত্মাগিরি একান্তই অর্থহীন। বাহিরের কাজ, রাজনৈতিক কাজ যাহা আমার জীবনের

অত্যন্ত অল্প অংশ সুতরাং ক্ষণস্থায়ী বস্তু, ইহা তাহারই ফল। যাহার স্থায়িত্ব আছে তাহা হইতেছে সত্যের প্রতি বিশ্বাস, অহিংসা এবং ব্রহ্মচর্য্য—ইহারাই আমার জীবনের প্রকৃত অংশ। এই স্থায়ী বস্তুগুলি, তাহাদের যত অল্পই আমি পাইয়া থাকি না কেন, তাহাদিগকে নিন্দা করা চলে না। ইহারাই আমার সর্ব্বস্ব। ব্যর্থতা এবং মোহ-মুক্তি—আমি তাহারও কামনা করি। কারণ তাহারাই সাফল্যের সোপান।*

* ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে অনুদিত।

বিশ্বাসে

চির-কৌমার্য্য সম্বন্ধে এত প্রশ্ন আমার কাছে আসিতেছে এবং এ-সম্বন্ধে আমার মত এত দৃঢ় যে, 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র পাঠকদিগকে আমার অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করা আর সম্ভবপর নহে। জাতীয় জীবনের এই সঙ্গীন মুহূর্ত্তে, এ কর্ত্তব্য আমি আরও বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি।

Celibacy শব্দটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আরও অনেকখানি বুঝায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত দেহ-যন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে রাখার নামই ব্রহ্মচর্য্য। নির্দ্দোষ ব্রহ্মচারীর পক্ষে কোনো কাজই অসম্ভব নহে। কিন্তু এ অবস্থা আদর্শ অবস্থা, কদাচিৎ ইহা বাস্তবে পরিণত হয়। ইহা ইউক্লিডের রেখার মতো—কল্পনায় যাহার অস্তিত্ব আছে অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা আঁকা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও জ্যামিতিতে এই সংজ্ঞাটির প্রয়োজনীয়তা প্রচুর—ইহা যে ফল প্রসব করে ঢের তাহার মূল্য। সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচারী আমাদের কল্পনাতেই অবস্থান করেন। কিন্তু এই আদর্শ যদি আমাদের মনের সামনে না থাকে তবে আমাদের অবস্থা হাল-বিহীন নৌকার মতো হইয়া দাঁড়ায়। এই কাল্পনিক অবস্থার যত কাছাকাছি আমরা পৌছাই, আমাদের উৎকর্ষ ততই চরমে আসিয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এখানে ব্রহ্মচর্য্য বলিতে চির-কৌমার্য্য—এই অর্থই আমি গ্রহণ করিতেছি। আমি বিশ্বাস করি যে, আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য জীবনে চিন্তা বাক্য এবং কাজে সম্পূর্ণ সংযম আবশ্যক। যে জাতির ভিতর এই

ধরণের মানুষ নাই সে জাতি সত্যই দরিদ্র। কিন্তু বর্ত্তমান জাতীয় জাগরণের সময় ব্রহ্মচর্য্যকে সাময়িক প্রয়োজন রূপেই আমি প্রচার করিতে চাই।

ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, ভিক্ষাবৃত্তি, এমন কি অনশন—এগুলি আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক সাধারণ হিসাবের বেশীই ভোগ করে। দাসত্বের দ্বারা আমরা এমনি সুকৌশলে নিষ্পেষিত যে, আমাদের অনেকেই ইহাকে দুঃখ বলিয়া মনে করেন না এবং অর্থনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক শোষণের ত্রিবিধ অভিশাপ সত্ত্বেও আমাদের অবস্থাকে উন্নতিশীল স্বাধীনতার পন্থা বলিয়াই মনে করেন। নিত্য-বর্দ্ধনশীল সামরিক ব্যয়, ল্যাঙ্কাশায়ার এবং অন্যান্য স্থানের ইংরাজদের স্বার্থের পরিপোষক ক্ষতিকর রাজস্ব-নীতি, ব্যয়-বহুল ভাবে পরিচালিত নানাবিধ সরকারী বিভাগ—ভারতবর্ষে যে শোষণ-পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই তাহার দারিদ্র্যকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে এবং ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তিও তাহার কমাইয়া দিয়াছে। গোখ্লের ভাষায় বলিতে হয়—শাসন-পদ্ধতি জাতীয় উন্নতিকে এমন ভাবে খর্ব্ব করিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহাকেও ঘাড় নোয়াইতে হইয়াছে। অমৃতসরে ভারতবাসীকে বুকে হাঁটিয়া চলিতে হইয়াছে। পাঞ্জাবের স্বেচ্ছাকৃত অপমান, ভারতীয় মুসলমানদের নিকট প্রদত্ত শপথের উদ্ধত অবহেলা, নৈতিক অনাচারের একান্ত আধুনিক উদাহরণ। আমাদের আত্মাকে তাহা আঘাত করিতেছে। এ দু'টি অন্যায়ের কাছে যদি আমরা মাথা নোয়াই, তবে আমাদিগকে শক্তিহীন করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়।

যে অধঃপতিত আবহাওয়ার কথা আমি বর্ণনা করিলাম জানিয়া শুনিয়া কি কেহ এই আবহাওয়ার ভিতর সন্তান পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন? অসহায়, ব্যাধিগ্রস্থ, দুর্ভিক্ষপীড়িত থাকিয়াও যদি জন্মহার বৃদ্ধির পদ্ধতি আমরা চালাইতেই থাকি, তবে আমরা কতকগুলি ক্রীতদাস এবং দুর্ব্বল লোকেরই জন্মদান করিব। যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয়, যে পর্য্যন্ত সে প্রতীকার-সাধ্য অনশনের প্রতিরোধ না করিতে পারে, দুর্ভিক্ষের সময় নিজেদের আহারের সংস্থান করিতে না পারে, যে পর্য্যন্ত না সে ম্যালেরিয়া, কলেরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ব্যাধির হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী জ্ঞান অর্জ্জন করে, সে পর্য্যন্ত বংশ-বৃদ্ধি করিবার অধিকার তাহার নাই। এদেশে যখন কোনও নূতন জন্মের কথা আমি শুনি, তখন সে সংবাদে আমি ব্যথাই অনুভব করি। স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা জন্ম-নিরোধের সম্ভাবনার কথা ঢের দিন হইতে আমি আনন্দের সঙ্গে চিন্তা করিয়া আসিতেছি। ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান জন-সংখ্যারই উপযুক্ত খবরদারী লইতে পারে না। অবশ্য এই অক্ষমতার কারণ জন-সংখ্যার অতিবৃদ্ধি নহে, তাহার কারণ বিদেশীদের প্রভুত্ব, আর ক্রম-বর্দ্ধনশীল শোষণই হইতেছে এই প্রভুত্বের মূল উদ্দেশ্য।

জন্মের এই নিরোধ কি উপায়ে সম্ভবপর? ইউরোপ যে সব দুর্নীতি-পূর্ণ, কৃত্রিম পদ্ধতির দ্বারা জন্ম-নিরোধ করে, উপায় তাহা নহে, উপায় হইতেছে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা এবং আত্মসংযম। বাপ-মা সন্তান-সন্ততিকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে ২৩ বৎসর হইতেছে বিবাহের নিম্নতম বয়স। ভারতের জননীরা যদি একথা বুঝিতে পারেন যে, পুত্র-কন্যাকে বিবাহের শিক্ষা দেওয়া পাপ,

তবে ভারতের অর্দ্ধেক বিবাহ আপনা হইতেই কমিয়া যায়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ বলিয়া ভারতের মেয়েরা শীঘ্র যৌবন প্রাপ্ত হয়—এইরূপ একটি ধারণা আছে। কিন্তু এই ধরণের ধারণার উপর আস্থা স্থাপন করিবার কোনোই হেতু নাই, ইহা একটি প্রকাণ্ড কুসংস্কার মাত্র। একথা আমি নিঃসঙ্কোচেই বলিতে চাই যে, যৌবন-প্রাপ্তির সহিত দেশের আবহাওয়ার কোনোই সম্পর্ক নাই। মানসিক অবস্থা এবং পারিবারিক জীবনের আবহাওয়ার উপরেই এই অসাময়িক পরিণতিটি নির্ভর করে। মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরা নির্দ্দোষ বালিকাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়াই তাঁহাদের নৈতিক কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যে, একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে তাহাদের বিবাহ হইতেই হইবে। অল্প বয়সেই তাহাদিগকে বাগ্‌দত্তা করা হয়, এমন কি তাহাদের ক্রোড়ে শিশুকেও দেখা যায়। বালক-বালিকাদের পোষাক এবং খাদ্য তাহাদের ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার সাহায্য করে। তাহাদিগকে আমরা খেলনার মতোই পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত করি, তাহাদের প্রয়োজনের জন্য নহে, আমাদের নিজেদের খেয়াল এবং গর্ব্বই তাহার মূলে রহিয়াছে। আমি অনেক শিশুকে পালন করিয়াছি। দেখিয়াছি, যে পোষাকই তাহাদিগকে দেওয়া যায় তাহাই তাহারা অতি সহজে আনন্দের সহিত গ্রহণ করে। আমরা তাহাদিগকে গরম এবং উত্তেজনাকর খাদ্য দিই। অন্ধ ভালোবাসায় তাহাদের শক্তির উপরেও লক্ষ্য রাখি না। ইহার ফলে হয়—অসাময়িক যৌবন, অপরিণত সন্তান, এবং অল্পবয়সে মৃত্যু। বাপ-মা যে উপদেশ দেন সন্তান তাহা অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। অসংযত ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যার দ্বারা ছেলেদের সম্মুখে তাঁহারা অসংযমের আদর্শই তুলিয়া ধরেন। পরিবারে যখন

অসাময়িক সন্তানের আবির্ভাব হয়, তখনও তাহাকে অভিনন্দিত করা হয় আনন্দ এবং ভোজের দ্বারা। বিস্ময়ের কথা এই যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়াও আমরা সংযত হই না। বিবাহিত লোকেরা যদি দেশের কল্যাণ চা'ন, ভারবর্ষকে যদি সবল, সুন্দর, সুপুষ্ট নর-নারীর দ্বারা অধ্যুষিত দেখিতে চা'ন, তবে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসংযমের পথ গ্রহণ করিতে হইবে—কিছু দিনের জন্য পুত্র-কন্যার জন্ম দানই বন্ধ করিতে হইবে। নব-পরিণীত দম্পতিকেও আমি এই উপদেশই দান করি। কোনো জিনিষ করিতে করিতে বন্ধ করা অপেক্ষা একেবারে না করাই সহজ। মাতাল—যাহারা অল্প-স্বল্প মদ খায় তাহাদের মদ্যপান ত্যাগ করা অপেক্ষা যাহারা কোনো দিনই মদ খায় না, তাহাদের পক্ষে মদের সংস্রব ত্যাগ করা যে সোজা তাহাতে সন্দেহ নাই। পতন হইতে উঠা অপেক্ষা খাড়া হইয়া থাকা ঢের বেশী সহজ। ইন্দ্রিয়চর্চ্চার দ্বারা যাহারা পরিতৃপ্ত হইয়াছে তাহাদের কাছেই ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলা ভালো—এ ধারণা ভুল। দুর্ব্বল লোকের কাছে সংযমের কথা বলার কোনো অর্থ নাই বলিলেই হয়। আমার বক্তব্য এই যে, যুবকই হোক্ আর বৃদ্ধই হোক্, পরিতৃপ্তই হোক্ আর অপরিতৃপ্তই হোক্, বর্ত্তমানে আমাদের এই দাসত্বের জের টানিয়া চলিবার জন্য উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করা আর সঙ্গত নহে।

পিতামাতার অধিকার বলিয়া যে একটি তর্কের জাল আছে, আমার অনুরোধ সেই তর্কের জালে কেহ যেন জড়াইয়া না পড়েন। অসংযমের জন্য মতামতের প্রয়োজন হয়, সংযমের জন্য তাহার প্রয়োজন নাই—একথা ধ্রুব সত্য।

শক্তিমান গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যখন আমরা জীবন-মরণ-সংশয় যুদ্ধে নিরত তখন দৈহিক, পার্থিব, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—সমস্ত রকমের শক্তিরই আমাদের প্রয়োজন আছে। যে জিনিষটা আমরা লাভ করিতে চাই, অন্য সমস্ত জিনিষের অপেক্ষা তাহাই বড় করিয়া দেখিতে না পারিলে তাহা লাভ করা যাইবে না। ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা আনিতে না পারিলে আমরা ক্রীতদাসের জাতিই থাকিয়া যাইব। যেহেতু গবর্ণমেণ্টের পদ্ধতি খারাপ, সেই হেতু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইংরাজদিগকে ঘৃণা করিতে হইবে, জাতি হিসাবে ব্যক্তিগত গুণেও তাহারা হীন—এই ধারণার দ্বারা যেন আমরা প্রতারিত না হই। মানুষের মূল ধর্ম্মগুলি সম্পর্কে আধ্যাত্মিকতার বড়াই না করিয়াও শারীরিক চর্চ্চা তাহারা প্রচুর পরিমাণেই করিয়া থাকে। তাহাদের যাহারা রাজনৈতিক জীবন গ্রহণ করে তাহাদের ভিতর অবিবাহিত নর-নারীর সংখ্যা এদেশের রাজনীতিকদের চেয়ে ঢের বেশী। আমাদের ভিতর অবিবাহিতা নারী নাই বলিলেও চলে। সন্ন্যাসিনী যাঁহারা আছেন রাজনৈতিক জীবনে তাঁহাদের কোনো প্রভাবই অনুভূত হয় না। কিন্তু ইউরোপে হাজার হাজার নর-নারী আছেন যাঁহারা সাধারণ ধর্ম্মরূপেই ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন।

পাঠকদের সাম্নে আমি এইবার গুটিকতক নিয়মের উল্লেখ করিব। নিয়মগুলির সার্থকতা কেবল আমার অভিজ্ঞতাতেই ধরা পড়ে নাই— আমার অনেক সঙ্গীর অভিজ্ঞতাতেও ধরা পড়িয়াছে।

১। বালক-বালিকাদিগকে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে এই বিশ্বাস লইয়াই পালন করিতে হইবে যে, তাহারা নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ থাকিতে পারে।

২। কেহই গরম এবং উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ করিবে না। মশ্লা-যুক্ত খাদ্য যেমন লঙ্কা চর্ব্বি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য, পিষ্টক, মিঠাই এবং ভাজা খাদ্য বর্জ্জন করিয়া চলিবে।

৩। স্বামী-স্ত্রী পৃথক পৃথক ঘরে শয়ন করিবে, এবং গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করিবে না।

৪। শরীর এবং মন উভয়কেই সর্ব্বদা ভালো কাজে নিযুক্ত রাখিবে।

৫। সন্ধ্যার পরেই শয়ন এবং অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করার নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে হইবে।

৬। অশ্লীল সাহিত্য পাঠ করিবে না। অসৎ চিন্তার প্রতিষেধক সৎচিন্তা।

৭। নাটক, সিনেমা প্রভৃতি যে সব জিনিষ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বাড়ায় সেগুলি পরিত্যাগ করিতে হইবে।

৮। রাত্রির দুঃস্বপ্নের দ্বারা বিচলিত হইবে না। শরীর সবল হইলে, এ সব ক্ষেত্রে প্রতিবার স্নান করাই বিধেয়। তাহাই ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। এই সব অনিচ্ছাকৃত স্বপ্নের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য মাঝে মাঝে যৌন-সঙ্গম আবশ্যক—এরূপ মনে করা ভুল।

৯। সর্ব্বোপরি এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা খুব কঠিন নহে, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর ভিতরেও তাহা অসম্ভব নহে। পক্ষান্তরে আত্মসংযমকে জীবনের সহজ ও সাধারণ নিয়ম রূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। পবিত্র ভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রত্যহ আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা মনকে ধীরে ধীরে পবিত্র করিয়া তোলে।*

---

* ইয়ং ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে অনুদিত।

পবিত্রতা

ব্রহ্মচর্য্য কি এবং কি করিয়া তাহা লাভ করা যায়—তাহাই জানিবার জন্য আমার কাছে অজস্র পত্র আসিতেছে। পূর্ব্বে এ-সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি এবং লিখিয়াছি বিভিন্ন ভাষায় আমি আবার তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে চাই। কলের মতো কৌমার্য্য রক্ষা করিয়া চলার নামই ব্রহ্মচর্য্য নহে। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ বশে রাখা বুঝায়,—চিন্তায়, বাক্যে এবং কার্য্যে ইন্দ্রিয়-পরবশতা হইতে মুক্ত হওয়া বুঝায়। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্ম-লাভের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল পথ।

যে আদর্শ ব্রহ্মচারী, কামেচ্ছার সহিত তাহার দ্বন্দ্ব করিতে হয় না। তাহার সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছাও থাকে না। ইহার হাত হইতে সে মুক্ত। সমস্ত পৃথিবী তাহার কাছে একটি প্রকাণ্ড পরিবারের মতো। মানুষের দুঃখ মোচনের চেষ্টাতেই তাহার সমস্ত ইচ্ছা কেন্দ্রীভূত, সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছাটাই তাহার কাছে বিরক্তিকর—ন্যক্কারজনক বলিয়া মনে হয়। যে মানবজাতির দুঃখের বিরাটত্ব সব দিক দিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে রিপুর দ্বারা তাহার চিত্ত উত্তেজিত হয় না। তাহার ভিতরের শক্তির উৎসকে সে অনুভূতি হইতেই জানিতে পারে, এবং এই উৎসকে সে সব সময় অপবিত্রতা হইতে মুক্ত রাখে। তাহার নম্র শক্তি সমস্ত জগতের নিকট হইতেই সম্মান লাভ করে, এবং দণ্ডধারী সম্রাট হইতেও তাহার প্রভাব ঢের বেশী।

কিন্তু এই কথাই আমাকে বলা হয় যে, এ-আদর্শ একটা অসম্ভব আদর্শ, নর-নারীর ভিতর যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, সে কথাটা আমি একেবারেই খেয়াল করি নাই। যে যৌন-আকর্ষণের কথা বলা হয়—তাহাকে স্বাভাবিক আকর্ষণ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। একথা যদি সত্য হয়, তবে অতি শীঘ্রই ধ্বংস আমাদের ভিতর নামিয়া আসিবে। নর-নারীর ভিতর যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা হইতেছে ভ্রাতা-ভগ্নীর, মাতা-পুত্রের, পিতা ও কন্যার। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই পৃথিবীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সমগ্র নারী জাতিকেই যদি ভগ্নী, কন্যা এবং মাতা বলিয়া আমি মনে করিতে না পারিতাম, তবে বাঁচিয়া থাকাই আমার পক্ষে কঠিন হইত—কাজ করা তো অসম্ভব হইতই। তাহাদের দিকে যদি কাম-দৃষ্টিতে তাকাইতে হয় তবে তাহাই তো ধ্বংসের সুনিশ্চিত পথ।

সন্তানোৎপাদন স্বাভাবিক ব্যাপার সন্দেহ নাই—কিন্তু সে কেবল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। এই সীমাকে যদি লঙ্ঘন করা যায় তবে তাহার ফলে নারী জাতি বিপন্ন হয়, জাতি দুর্ব্বল হয়, ব্যাধি দেখা দেয়, পাপের পথ পরিষ্কৃত হয়, এবং পৃথিবী অসাধু হইয়া পড়ে। যে মানুষ কামেচ্ছার বশ সে তাহার নিরাপদ আশ্রয়ই হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ লোক যদি সমাজের পরিচালক হয় এবং লেখার ভিতর দিয়া সে যদি তাহার মতবাদ ব্যক্ত করিতে থাকে এবং জন-সমাজ যদি তাহাই মানিয়া লয়, তবে সমাজের অস্তিত্বই কি থাকিতে পারে? কিন্তু এই ব্যাপারই আজকাল ঘটিতেছে। যে পতঙ্গ প্রদীপের চারিধারে ঘুর-পাক খায় সেই যদি তাহার ক্ষণস্থায়ী আনন্দের মুহূর্ত্তগুলির কথা বলে এবং তাহাকে আদর্শ মনে করিয়াই আমরা যদি তাহার অনুসরণ করি, তবে বাঁচিয়া থাকাই কি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর

হয়? না—তাহা অসম্ভব। আমার যতটুকু শক্তি আছে তাহার সমস্তখানি প্রয়োগ করিয়াই আমি বলিতেছি, যৌন-আকর্ষণ—এমন কি স্বামী-স্ত্রীর যৌন-আকর্ষণও অস্বাভাবিক। দম্পতির অন্তর হইতে পাপ রিপুগুলি দূর করিবার—তাহাদিগকে ভগবানের নিকট টানিবার উদ্দেশ্যেই বিবাহের ব্যবস্থা। স্বামী-স্ত্রীর ভিতর কামেচ্ছাশূন্য ভালবাসা অসম্ভব বস্তু নহে। মানুষ পশু নয়। অসংখ্য পশু জন্মের পর সে এই উচ্চতর স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য। চা'র পায়ে হাটিবার জন্য বা গড়াইয়া চলিবার জন্য সে জন্ম গ্রহণ করে নাই। আত্মা যেমন বস্তু হইতে বহু দূরের জিনিষ, মনুষ্যত্বও তেমনি পশুত্ব হইতে ঢের দূরের জিনিষ।

উপসংহারে ইহা লাভের উপায় আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব :—

প্রথম উপায় হইতেছে—'ইহার আবশ্যক আছে' এই সত্য অনুভব করা। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে আয়ত্তাধীনে আনা। ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্বাদেন্দ্রিয়ের সংযম অপরিহার্য্য। সে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আহার করিবে, অপবিত্র জিনিষের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। মাটির দিকে চাহিয়া চলা এবং এক জিনিষ হইতে অন্য জিনিষের দিকে না তাকানো, এই জন্যই নম্রতার পরিচায়ক। ব্রহ্মচারী অশ্লীল কথা বা অপবিত্র কথাও শুনিবে না, অথবা তীব্র ও উত্তেজক গন্ধেরও ঘ্রাণ লইবে না। পরিষ্কার মাটির গন্ধ কৃত্রিম এসেন্স বা গন্ধ দ্রব্য হইতে ঢের বেশী মিষ্টি। ব্রহ্মচর্য্য লাভের যে আশা রাখে, জাগ্রত অবস্থায় সমস্ত সময় হাত এবং পা'কে তাহার স্বাস্থ্যকর কাজে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে উপবাসও তাহার পক্ষে প্রয়োজন।

তৃতীয় উপায় হইতেছে—'সাধুসঙ্গ, সচ্চরিত্র বন্ধু, এবং সৎগ্রন্থ।'

সর্ব্বশেষ উপায় হইতেছে--'উপাসনা।' তাহাকে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে একান্ত আগ্রহে রামায়ণ পড়িতে হইবে এবং ভগবানের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে।

সাধারণ পুরুষ বা নারী কাহারও পক্ষেই কাজগুলি সম্পন্ন করা অসম্ভব নহে। এগুলি অত্যন্ত সহজ এবং সহজ বলিয়াই এগুলি পালন করিতে গিয়া বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। বস্তুতঃ যেখানে ইচ্ছা আছে পথ সেখানে যথেষ্টই সহজ হইয়া যায়। মানুষের আদতে ইহাকে লাভ করার ইচ্ছা নাই, তাই তাহারা হাতড়াইয়া ফেরে। অল্প হোক্ আর বেশীই হোক্, সংযম পালনের উপরেই পৃথিবী দাঁড়াইয়া আছে। ইহা হইতেই বোঝা যায়, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক আছে এবং তাহা পালন করাও অসম্ভব নহে। *

সমাপ্ত

* ইয়ং ইণ্ডিয়ার প্রকাশিত গান্ধীজীর প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।